# বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 537. May, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৬ বর্ষ। ৫৩৭ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩১৫। মে, ১৯০৮। } ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *বৈ | জ্যৈ | আ | শ্রা | ভা | আ |
| আঃ | ম | বৃ | সো | বৃ | সো | বৃ |
| শেঃ | ৩০ | ৩২ | ৩১ | ৩২ | ৩১ | ৩০ |
| | বৃ | র | বু | শু | বু | শু |
| | †A | M | J | Jy | A | S |
| | ‡14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| আঃ | বু | শু | সো | বু | শ | ম |
| শেঃ | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| | বৃ | র | ম | শু | সো | বু |

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সাল।
ফসলী ১৩১৫-১৬।
হিজরী ১৩২৬-২৭।
খৃষ্টাব্দ ১৯০৮-৯।
শকাব্দা ১৮৩০।
সংবৎ ১৯৬৫-৬৬।
মগী ১২৭০-৭১।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৭৯-৮০।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কা | অ | পৌ | মা | ফা | চৈ |
| আঃ | শ | সো | বু | বৃ | শ | র |
| শেঃ | ৩০ | ৩০ | ২৯ | ৩০ | ২৯ | ৩১ |
| | র | ম | বু | শু | শ | র |
| | O | N | D | J | F | M |
| | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 |
| আঃ | বৃ | র | ম | বু | সো | সো |
| শেঃ | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| | শ | সো | বু | র | র | বু |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ম | বৃ | সো | বৃ | সো | বু |
| বু | শু | ম | শু | ম | শু |
| বৃ | শ | বু | শ | বৃ | শ |
| শু | র | বৃ | র | বৃ | র |
| শ | সো | শু | সো | শু | সো |
| র | ম | শ | ম | শ | ম |
| সো | বু | র | বু | র | বু |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| §১ | ৮ | ১৫ | ২২ | ২৯ |
| ২ | ৯ | ১৬ | ২৩ | ৩০ |
| ৩ | ১০ | ১৭ | ২৪ | ৩১ |
| ৪ | ১১ | ১৮ | ২৫ | ৩২ |
| ৫ | ১২ | ১৯ | ২৬ | |
| ৬ | ১৩ | ২০ | ২৭ | |
| ৭ | ১৪ | ২১ | ২৮ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শ | সো | বু | বৃ | শ | র |
| র | ম | বৃ | শু | র | সো |
| সো | বু | শু | শ | সো | ম |
| ম | বৃ | শ | র | ম | বু |
| বু | শু | র | সো | বু | বৃ |
| বৃ | শ | সো | ম | বৃ | শু |
| শু | র | ম | বু | শু | শ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বৈ | জ্যৈ | আ | শ্রা | ভা | আ |
| শুঃ এঃ, | ২৯ | ২৮ | ২৬ | ২৪ | ২১ | ২০ |
| পূঃ, | ৩ | ১,৩২ | ২৯ | ২৮ | ২৫ | ২০ |
| কৃঃ এঃ, | ১৩ | ১৩ | ১০ | ৯ | ৬ | ৫ |
| অঃ, | ১৭ | ১৭ | ১৪ | ১৩ | ১০ | ৯ |

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।
*‖ ২৯এ বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২৮এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার শুক্ল একাদশী। ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ৩২ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ১৩ই বৈশাখ রবিবার ও ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী, ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* চৈত্র বৈশাখ মঙ্গলবার আরম্ভ ও ৩০শে বুধবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল আরম্ভ বুধবার, শেষ ৩০শে বৃহস্পতিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ মঙ্গল, ২রা বুধ ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি।

বৈশাখ মঙ্গল } ১ ৮ ১৫ ২২ ২৯
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি }

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কা | অ | পৌ | মা | ফা | চৈ |
| শুঃ এঃ, | ১৭ | ১৯ | ১৮ | ১৮ | ১৮ | ১৮ |
| পূঃ, | ২৩ | ২২ | ২২ | ২৩ | ২২,২৩ | ২৩ |
| কৃঃ এঃ, | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ২ |
| অঃ, | ৯ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ |

*‖ ১৭এ কার্ত্তিক বুধবার ও ১৯এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্ল একাদশী। ২৩এ কার্ত্তিক রবিবার ও ২২এ অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ণিমা, ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী, ৯ই কার্ত্তিক রবিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে দিন, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

# নববর্ষে

## বামাবোধিনীর প্রার্থনা।

বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পুনরায় বর্ষ-চক্র ঘুরিয়া আসিল। এই বিশাল সৃষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া, ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১ শে চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবী সূর্য্য-মণ্ডলীর চতুর্দ্দিক্ একবার প্রদক্ষিণ করিল। পৃথিবী কত কাল হইতে এইরূপ ঘুরিতেছে এবং আরও কত কাল ঘুরিবে তাহার ঠিক নাই। এই পর্য্যটনের অন্ত নাই, একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। এই প্রদক্ষিণ আরম্ভের মহাদিন ১লা বৈশাখ। এই স্মরণীয় পবিত্র দিনই নব-বর্ষের সূচনা।

এই নববর্ষের আগমনে মানবমাত্রেরই অতীতের আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেয়ঃসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। গত বর্ষে কি কি করিয়াছি এবং তাহার ফলাফলই বা কিরূপ দাঁড়াইল, ইহা নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া যিনি বর্ত্তমান জীবনকে শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, যিনি অতীতের লাভালাভ গণনা করিয়া নিজ জীবন-কারবারের হাল খাতা ঠিক করিতে পারেন, তিনি লাভবান্ হন। কাল অনন্ত, মানব আত্মাও অক্ষয়, অতএব গত বর্ষে বুদ্ধিদোষে অনেক ক্ষতি করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। একান্ত ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্ব বর্ষের ক্ষতি পূরণ করিয়াও ভাবি-জীবনের জন্য অনেক সঞ্চয় করিতে পারা যায়। কোন বালক যদি আলস্যে বা কুসঙ্গে পড়িয়া নিজ পাঠাভ্যাসের এরূপ ক্ষতি করে যে, সে বর্ষান্তে প্রমোশন্ না পাইয়া ডিগ্রেড্ হয় এবং সেই ক্ষতি পূরণের জন্য সে প্রাণপণ করিয়া পাঠাভ্যাস করে, তবে আগামী বর্ষে সে বালক দুই ক্লাস বা তিন ক্লাস উপরে উঠিয়া যাইতে পারে। সাধনা যত গভীর, যত প্রগাঢ় ও যত বিপুল হইবে, সিদ্ধিলাভও তত নিকটবর্ত্তী হইবে।

"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ"

ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় কালও টুক্ টুক্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে প্রতি পলকেই পরমায়ু পলে পলে ক্ষয় পাইতেছে। সময়ের যে অংশটুকু যাইতেছে, তাহা আর ফিরিবার নয়, এজন্য নিমেষার্দ্ধ সময়কেও বিফলে যাইতে দিবে না। এক-জন কবি বলিয়াছেন ;—

"আয়ুষঃ ক্ষণো একোপি ন লভ্যঃ স্বর্ণ-
কোটিভিঃ।
স চেৎ বিফলতাং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽ-
ধিকা ॥"

অর্থাৎ কোটি কোটি স্বর্ণ দিলেও আয়ুর একটী পলও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সেই আয়ু যদি বিফলে যায়, তবে তদপেক্ষা ক্ষতির বিষয় আর কি আছে ?

এই অমূল্য নীতিবাক্যটী প্রত্যেকেরই

জীবনের ইষ্টমন্ত্র হওয়া উচিত। মানবের সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতির নিদান ভাবনাশুদ্ধি। মন শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত না হইলে, হৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি না হইলে, মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অসিদ্ধ মানবের শান্তিলাভ কোথায়? এ জগতে একমাত্র সাধু মহাত্মারাই শ্রেয়ঃপথের প্রবর্ত্তয়িতা, শান্তিরাজ্যের নেতা। যাঁহার উপদেশে ও সহবাসে জড় জীবন চৈতন্যময় হয়, তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিও। অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যিনি অসাধুকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি চন্দনভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

এ জগতে পূতনা রাক্ষসীর ন্যায় বহুতর ছদ্মবেশী কপট ব্যক্তি সাধুবেশে বিচরণ করে। সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষণে সতর্ক হইতে হইবে। কাল অনন্ত। যদি ঐকান্তিকতা থাকে, তবে তুমি শতবার সিদ্ধিলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়াও শেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে।

তোমার বিপদ্ যতই ঘনীভূত হউক, তোমার যতই প্রাণসঙ্কট মহাভয় উপস্থিত হউক, তুমি অটল ধৈর্য্য সহকারে বিচার করিয়া চলিলে তোমাকে অবসন্ন হইতে হইবে না। গতবর্ষে তোমার বড় বিপদ গিয়াছে, দিনগুলি বড় নিরানন্দে কাটিয়াছে, ইহা ভাবিয়া হতাশ বা অবসন্ন হইও না। সেই সর্ব্বসঙ্কটহারী দয়াময়কে একান্তভাবে স্মরণ কর, তাঁহার মঙ্গলময়ী বিভূতিগুলির নিরন্তর আলোচনা কর, সর্ব্বভূতেই সেই করুণাময়ের সত্তা হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অনুভব করিয়া সর্ব্বত্রই অদ্বৈত প্রেম নিবদ্ধ কর, তোমার বিপদ কাটিবেই।

"বিপদে ডোবে কি তার তরি?
শর্ম্ম বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম গতি মুক্তি যার হরি।"

হে অসীম করুণা-সিন্ধু হরি! আজ এই শুভ দিনে তোমার চরণে এই প্রার্থনা,—যিনি আমাদের জীবনপথের নেতা, যাঁহার করুণা এ দেশের ও এই ক্ষুদ্র জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত, যিনি বঙ্গমহিলাগণের শুভকামনায় অহরহ দেহের অস্থি, মজ্জা ক্ষয় করিয়াছেন, জীবনের সমস্ত সাধনাকে বঙ্গবামাকুলের উন্নতিকল্পে অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, আজি সেই বিশ্বহিতৈষী মহাত্মা সুরলোকে। হে দয়াময়! আজি এই নিরাশ্রয়া অনাথিনী বামাবোধিনীকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই পূজনীয় পিতৃদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমাদের দোষ ত্রুটি দূর হউক, আমরা যেন দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস পাইতে পারি। যাঁহাদের অনুগ্রহে আমি এত কাল জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছি, আজ তাঁহাদেরও সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

নববর্ষ আমাদের আশা, উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করুক এবং জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে শক্তি ও সিদ্ধি দান করুক।

# সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহিলা মহাসমিতি—শুনা যায়, আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় মহিলাবৃন্দের একটী মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। ভারতের নানাদেশীয় মহিলাগণ মিলিত হইয়া স্বদেশের উন্নতি সম্বন্ধে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

জৈন অনাথ-শিশু-আশ্রম—পঞ্জাবে হিসার সহরে জৈনগণ ভারতের নানা স্থানের পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাদিগের ভরণ পোষণ ও উপযুক্ত শিক্ষার জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে ৫০০ বালকবালিকার থাকিবার স্থান করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নতি—আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ হীরালাল যাদা একপ্রকার নূতন তাঁতের উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন শ্রীমন্ত ইন্দিরা রাজা লুম।

বোম্বাই পারেলের শ্রীযুক্ত পিরোশ শা বায়জোরজী গোধরাজ এক প্রকার নূতন লোহার সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিদেশী শিল্পের মোহে উদ্ভাবনী শক্তি স্তিমিত ছিল, এক্ষণে ভারতবাসীর সেই ঘোর কাটিতেছে।

ভূগর্ভে গ্রাম—সম্প্রতি লাহোরে সালিমার বাগের নিকট রেলপথের ধারে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটী উপবিষ্টা স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি বাহির হয়, কিন্তু তাহা স্পর্শ করিবামাত্রই চূর্ণ হইয়া যায়। পরে আরও মৃত্তিকা উত্তোলন করিবার পর তথায় ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ ও স্তম্ভ বাহির হয়। ইহা কোন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান হয়। ভূমিকম্প কিম্বা কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপ্লবে ইহা মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল।

রমণীর সম্মান—হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী হুমাউন মির্জ্জা নাম্নী জনৈক মহিলা "মুসির-ই-নিসবান" নামক একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মুসলমান্ লেখিকা-প্রণীত উপন্যাস হায়দ্রাবাদে ইহাই প্রথম। সেই জন্য গ্রন্থকর্ত্রীকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী ওয়াকারের গৃহে তত্রত্য অনেকগুলি মহিলা সম্মিলিত হইয়া শ্রীমতী মির্জ্জাকে একটী রৌপ্য পদক উপহার দিয়াছেন। এই সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী ওয়াকার ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

স্বার্থত্যাগ—রাজলক্ষ্মী বাই নাম্নী ঢাকার জনৈক বারবনিতা তত্রত্য জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশের কল্যাণার্থে দান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্বদেশভক্ত লিয়াকৎহোসেন—স্বদেশভক্ত মৌলবী লিয়াকৎহোসেন জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত শুক্রবার কলিকাতার গড়ের মাঠে তাঁহার প্রতি

সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভাস্থলে "লিয়াকৎহোসেন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার" প্রতিষ্টিত হয়।

তারবিভাগের গোলযোগ—তারবিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের গুরুতর পরিশ্রমের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বেতন-বৃদ্ধির আবেদন করেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আবেদনে আদৌ কর্ণপাত না করায় অনেক সিগ্‌নালার ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে। ফলে সংবাদাদি প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে এবং প্রত্যেক আফিসে অনেক সংবাদ পড়িয়া থাকিতেছে।

মদ্যপান-নিবারণী সভা—পুনার মদ্যপান-নিবারণী সভা সহরে মদ্যপান নিবারণের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন। তথাকার যুবকেরা মদের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন এবং সহরের যে সকল লোকের বাটীতে মদের দোকান আছে, তাঁহারা দোকানদারদিগকে দোকান উঠাইয়া লইবার জন্য নোটীস দিয়াছেন।

বড়লাট-কন্যার বিবাহ—বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কন্যা লেডী রুবী ইলিয়টের সহিত ভাইকাউণ্ট এরিংটনের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহে ভারতের সম্রাট্ সাম্রাজ্ঞী ও অনেক লর্ড প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন।

## ভক্তকবি তুলসীদাস*।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

নারদ, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, হরিদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি অলৌকিক ভক্তচরিত্রে দেখা যায়,—তাঁহাদের নিকটে ভগবান্ ও ভগবানের নাম একই পদার্থ। নামের সঙ্গে ভগবানকে তাঁহারা একীভূত করিয়াছেন, ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়াছেন। ইহার যাথার্থ্য আমরা অনেক সময় অনুভব করি। প্রিয়তম ব্যক্তির নাম করিলেই সে ব্যক্তি সম্মুখে প্রতিভাত হয়। সে অভীষ্ট পদার্থ পরলোকগত হইলেও, ঐ নামের আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়। পরলোকগত মাতাপিতার নাম যখনি করি, তখনি কি সেই প্রাণারাম মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হয় না? আন্তরিক ভাবসূত্রে নাম ও নামী নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বাক্যের সঙ্গে অর্থের ন্যায়, নামের সঙ্গে নামীর সম্বন্ধ অক্ষয় ও অচ্ছেদ্য। গভীর চিন্তাশীল অদ্বিতীয় পণ্ডিত কারলাইল্ ফরাসিবিপ্লবের ইতিহাস

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে তুলসীদাসের কারাবোধ সাজাহানের সময়ে লিখিত হইয়াছে। উহা আকবরের সময় ঘটিয়াছিল।

লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন; —"কোনও ব্যক্তি বা কোনও বস্তুর নামটী মনে হইলেই, সেই ব্যক্তির বা সেই বস্তুটার আকৃতি, প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। তখন আমরা সেই পদার্থটাকে বিশেষরূপে জানিতে পারি। সেই পদার্থটী তখন আমাদের নিজের হয়। "Any approximation to the right name has value: were the right name itself once here, the thing is known henceforth; the thing is then ours." ( Carlyle's History of the French Revolution, Vol. III. Book V., Chapter I. )

ভক্তমাত্রেই নাম ও নামীর অভেদ স্বীকার করেন। নাম ও নামীর পরস্পর এ সম্বন্ধ না থাকিলে চৈতন্য, হরিদাস, নিত্যানন্দ, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তেরা নামের প্রভাবে জগৎ মাতাইতে পারিতেন না, ফাঁকা শব্দে পাখী মরে না। তুলসী বলিতেছেন;—

"রামনাম সব ধর্ম্মময়, জানত তুলসীদাস।
যথা ভূমি বশ বীজ মে,নখত নিবাস অকাস॥
রামনামরতি রামগতি, রামনাম বিশ্বাস।
সুমিরত শুভ মঙ্গল কুশল, চহু দিশি তুলসীদাস॥
রামনাম পরতাপতে প্রীতিপ্রতীতিভরোস।
সো তুলসী সুমিরত সকল, সগুণ সুমঙ্গল কোষ॥"

অর্থাৎ—রামনামই সর্ব্বধর্ম্মের সার, এ কথা তুলসী জানিয়াছে। যেমন বীজের সঙ্গে ভূমি এবং নক্ষত্রের সঙ্গে আকাশ, তেমনি নামের সঙ্গে ভগবান্ সম্বন্ধ। রাম-নাম আমার মতি, গতি ও রতি; রাম-নাম আমার প্রতীতি ও ভরসা; রাম-নাম সর্ব্ব গুণের ও সর্ব্ব মঙ্গলের আধার। তুলসী রামনামে তন্ময় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পুণ্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় দেখিতেছে।

ভগবানে যাহার এমন বিশ্বাস, এমন প্রেম, এত দৃঢ়তা, এত আনন্দ না হয়, এই মর্ম্মবিদারী, রক্তাক্ত ভীষণ সংসারে তাহার শান্তি কোথায়?

তুলসীদাস প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সায়ংকালে স্বরচিত নব নব স্তোত্রে ইষ্টদেবের স্তব করিতেন। স্তোত্রগুলি প্রেমভক্তির মাধুর্য্যে পরিপ্লুত। তাঁহার একটী প্রভাতী স্তোত্র উপহার দিতেছি;—

( স্থান—অযোধ্যা; উষাকাল )

"জাগিয়ে রঘুনাথকুঁবর! পক্ষী বন বোলে।
(ধুয়া)
চন্দ্রকিরণ শীতল ভঈ চকঈ পিয় মিলন গঈ,
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন, পল্লব দ্রুম ডোলে। ১।
প্রাত ভানু প্রকট ভয়ো রজনীকো তিমির গয়ো,
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ গান, কমলনদল খোলে। ২।
ব্রহ্মাদিক ধরত ধ্যান, সুর-নর-মুনি করত গান,
জাগনকী বের ভঈ, নয়নপলক খোলে। ৩।
তুলসীদাস অতি অনন্দ, নিরখিকৈ মুখারবিন্দ,
দীননকো দেত দান, ভূষণ বহু মোলে॥"

( অনুবাদ ) ;—( ১ )

জাগ দয়াময় ! রঘুবংশের গৌরব !
বিপিনে বিহঙ্গকুল করে কলরব।
প্রভাহীন বিমলিন চন্দ্রমা গগনে,
চলিয়াছে চক্রবাকী প্রিয়-সম্মিলনে।
লতাগ্র পল্লবরাজি করি' আন্দোলন,
সুরভি শীতল মন্দ বহিছে পবন।
নিশার তিমিররাশি করিয়া হরণ,
উদিল গগনতলে তরুণ তপন।
ফুটিছে কমলকুল, গুঞ্জে অলিগণ,
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধেয়ানে মগন।
প্রভাতী মঙ্গলগীতি গায় সুর-নর,
জাগিবার বেলা হৈল উঠ রঘুবর !
হে নাথ ! হেরিলে তুঁহ ও মুখকমল,
তুলসী পরমানন্দে হইবে বিহ্বল।
উঠি প্রভু ! শ্রীঅঙ্গের অমূল্য ভূষণ
খুলিয়া দরিদ্রগণে কর বিতরণ। ( ২ )

এই সকল স্তোত্র পড়িলে জ্ঞান হয়, তুলসীদাস সেই ত্রেতাযুগের মনুষ্য, রামের সমকালীন, তাঁহারি অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর। তিনি যেন আপন ইষ্টদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যিনি ধ্যানযোগে তন্ময়, বাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট তিরোহিত, অন্য পদার্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধ্যেয় বস্তুই তাঁহারি অভিমত রূপ ধারণ-পূর্ব্বক ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার নয়ন ও মনকে সন্তর্পিত করে। এ সত্য আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখনি ৺পিতা-মাতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাই, তখনি তাঁহারা ঠিক্ সেই রূপে ও বেশে আমার সম্মুখীন হন। তাঁহারা বিপদে অভয় দান করেন, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, অমৃতায়মান বাক্যে সান্ত্বনা দান করেন। আমি যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তাঁহারাও অন্তর্হিত হন। ধ্যাতা ও ধ্যেয় এ উভয়ের এ নিগূঢ় সম্বন্ধের মধ্যে বিশ্বপতির অলক্ষ্য ও অচিন্তনীয় সত্তা নিহিত রহিয়াছে।

সম্প্রতি আমার বাটীতে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোনও দুরাত্মা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গলায় ছুরি মারিয়াছিল। ঐ আঘাতে তাহার প্রাণরক্ষার আশা কেহই করেন নাই। পুত্রটীকে তৎক্ষণাৎ হাস-পাতালে পাঠান হয়। আমি বাটী আসিয়া ঐ ঘটনা শুনিয়াই বজ্রাহতের ন্যায় সংজ্ঞা-শূন্য হই। সংজ্ঞালাভ করিয়াই গলদশ্রু-লোচনে আমার স্বর্গীয় মাতা-পিতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার ঐ পুত্রটী আমার ৺মাতা-পিতার বুকের হাড় ছিল। আমার সে মর্ম্মভেদী প্রার্থনা তাঁহারা শুনিলেন। উভয়েই আমার সম্মুখে উপস্থিত ! কোনও কথা বলিলেন না, কেবল হাত তুলিয়া অভয় দান করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। আমারি পুত্রটী স্বল্প সময়েই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

(১) মূলের মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হইল না। হিন্দি ও সংস্কৃত পদ্যে যেরূপ স্বল্পাক্ষরে ভাব প্রকাশ করা যায়, বঙ্গভাষায় তাহা সম্ভব নহে।

(২) ভারতবর্ষে পূর্ব্ব নৃপতিগণের নিয়ম ছিল,—তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়াই নিজ অঙ্গের বহুমূল্য বসন, ভূষণ সমস্ত উন্মোচন করিয়া দীনদরিদ্রগণকে দান করিয়া, নব বসন ভূষণ পরিধান করিতেন।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যাঁহারা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা বলেন—"পরলোকগত আত্মীয়েরা অনেক সময় আমাদের নিকটেই থাকেন, সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, এবং নানা বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। এ কেবল মুখের কথা নহে, ফটোগ্রাফ্ ছায়াচিত্রে এ বিষয় নানা স্থানে নানা ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল, স্কটলণ্ডের গ্লাসগো নগরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল;—এক ব্যক্তি, কোনও অপরিচিত ফটোগ্রাফ শিল্পীর কার্য্যালয়ে নিজের ছবি তোলাইতে গিয়াছিল। প্রথম বার সেই লোকের প্রতিমূর্ত্তি কাচের উপর যেরূপ প্রতিফলিত হইল, শিল্পী সবিস্ময়ে তাহা দেখিয়া, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে,—যে লোকের ছবি গৃহীত হইতেছিল, তাহার মুখছবির পার্শ্বে অন্য এক স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি উঠিয়াছিল। শিল্পী তিন চারি বার তাহার ছবি তুলিল, তিন চারি বারই ঐরূপ হইল। অবশেষে শিল্পী সেই যুগলমূর্ত্তি সম্বলিত কাচখানি সেই লোককে দেখাইল। লোকটী দেখিল যে, তাহার মৃতা পত্নীর ছবি সেই কাচে উঠিয়াছে। অল্প দিন হইল বঙ্গদেশের পাবনা জেলায় ঠিক্ ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

জাপানবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে;—"পরলোকগত আত্মীয়েরা ভৌতিক দেহে সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে থাকেন, এবং আমাদের হিতসাধন করেন।" জাপান-রণতরীর নেতা মহাবীর টোগো বলেন :—"আমি কেবল ৺ পিতৃপুরুষগণের সহায়তায় রুষের বিপুল রণপোতসমূহকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

চেতন, অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্মের অংশ বা শক্তিকলা নিহিত আছে।

"দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে
বিভূতিষু॥"
(কালিদাস)

—হে ব্রহ্ম! তুমি দ্রব ও পরমাণু সমষ্টির সংশ্লেষে কঠিন; তুমিই স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম; তুমিই লঘু, তুমিই গুরু; তুমিই ব্যক্ত (কার্য্য), তুমিই অব্যক্ত (কারণ); তোমার বিভূতি অনন্ত।

ব্রহ্মের ঐ শক্তিকলা বা অংশ থাকাতেই, সমস্ত পদার্থই একটী সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতাসূত্রে আবদ্ধ। ঐ সজাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতা দ্বারাই পদার্থে পদার্থে এবং পদার্থে ও ব্রহ্মে পরস্পর আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। পদার্থমধ্যে যদি ব্রহ্মশক্তি না থাকিত, তবে এক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিতে পারিত না; কেননা পদার্থের নিজের এমন কোনও শক্তি বা গুণ নাই যে, সে অপরকে আকর্ষণ করিতে পারে। অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মশক্তিকে শিক্ষাভ্যাসাদি সাধনা দ্বারা যিনি যত প্রসারিত করিতে পারেন, তাঁহার আকর্ষণশক্তি ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাঁহা দ্বারা অত্যদ্ভুত, অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"

ব্রহ্মই যাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, ব্রহ্মই যাঁহার ব্রত সাধনা, ব্রহ্মই যাঁহার জপ-তপ-আরাধনা; যিনি ব্রহ্মেই সুপ্ত, ব্রহ্মেই জাগরিত, ব্রহ্মেই শয়িত, ব্রহ্মেই উপবিষ্ট, ব্রহ্মেই চলিত, ব্রহ্মেই অবস্থিত; যাঁহার কায়মনোবাক্য, সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত; যাঁহার প্রতি লোমকূপ, প্রতি নিশ্বাস হইতে ব্রহ্মভাব উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তিনি পার্থিব দেহ ধারণ করিয়াও ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তখন তাঁহার শক্তি ও কার্য্যকলাপ সকলি অলৌকিক। এজন্য, সিদ্ধপুরুষগণের কার্য্যকলাপ, লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দ্বারা বিচার্য্য নহে। যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের এবং ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষের অসাধ্য নহে।

এই ঐশী শক্তি বা ব্রহ্মভাব লাভের একমাত্র উপায়—সদ্‌গুরু সাধুর সহবাস। মন্বাদি ব্রহ্মদর্শী মহর্ষিরা সদ্‌গুরুকে "ব্রহ্ম-মূর্ত্তি," এবং সদ্‌গুরু-সহবাসে শিষ্যের যে অবস্থান্তর হয়, তাহাকে "ব্রহ্মজন্ম" বলিয়াছেন। তাঁহারা ঐ ব্রহ্মজন্মকেই অজর ও অমর জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মলিন অঙ্গার যেমন অগ্নিসংযোগে অগ্নিময় হয়, জড়বুদ্ধিও তেমনি সদ্‌গুরু-সহবাসে চৈতন্যময় হয়। এ বিষয়ে তুলসীদাসের নিম্নলিখিত গাথাটি অতুলনীয়।

"অঙ্গারঃ শতধৌতোঽপি মলিনত্বং ন
মুঞ্চতি"।

—এই নীতিবাক্যের খণ্ডন করিয়া তুলসী কহিলেন;—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ;
তও কয়লাকি ময়লা ছোটে
যও আগ করে পরবেশ।"

অর্থাৎ, সদ্‌গুরুর জ্ঞানোপদেশে শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত মলিনতা তিরোহিত হয়, যেমন অঙ্গারমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে, অঙ্গারের মলিনতা নষ্ট হয়। তুলসীর আধ্যাত্মিক মহোন্নতির মূল—কাশীধামে সদ্‌গুরু সাধুর সঙ্গলাভ। এজন্য সাধুসঙ্গ-মহিমা তিনি স্বীয় কাব্যে ও গাথায় সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশোক ও অমর ব্রহ্মভাব লাভ করা মাদৃশ হীনমতি দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অসম্ভব, ইহা ভাবিয়া তুলসী একদিন হতাশ ও অবসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে শ্রমণার উপাখ্যান শুনাইলেন। তুলসী সতৃষ্ণহৃদয়ে তাহা শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিষাদ, অবসাদ সকলি দূর হইল, বদনে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দেখা দিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, কপোল বহিয়া দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি নতশীর্ষে সেই শবরকন্যার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিলেন। আশায় ও আশ্বাসে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল। অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রমণার কথা এইরূপ কীর্ত্তিত আছে (১);

(১) শ্রমণার কথা বাল্মীকি রামায়ণে সংক্ষেপে আছে। পদ্মপুরাণোক্ত রামায়ণে ও অধ্যাত্ম-

শ্রমণা শবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। তিনি শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা, নিরাশ্রয়া। এ সংসারে যাহার কেহই নাই, ভগবানই তাহার আশ্রয়, এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গ বিনা সে নিধি মিলেনা। সদ্গুরুলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অস্পৃশ্য জাতি দেখিলে সকলেই দূরে পলায়ন করে। শবরী সাধুসঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্তার ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কৃপা করিল না। যেখানে ইষ্টবস্তুর জন্য হৃদয়ে সান্নিপাতিক তৃষ্ণা, সেখানে তাহার একটা উপায় হইবেই। অবশেষে পরম কারুণিক ভগবান্ মতঙ্গ মুনি কৃপা করিয়া শবরীকে আশ্রয় দিলেন। মহর্ষি শুভক্ষণে শ্রমণাকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার প্রতি অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। শ্রমণা অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে ঋষিগণের সেবা করিতেন এবং হৃদয়ে অনুক্ষণ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। শবরীর সেবা, ভক্তি ও দীনতা দর্শনে আশ্রমবাসী ঋষিমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে সেই আশ্রমের ঋষিরা ধরাধাম পরিহার করিয়া, তপঃ প্রভাবলব্ধ অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। একাকিনী শবরী সেই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র তখন পিতৃসত্যপালনার্থে বনবাসী। দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীকে হরণ করিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। ভীষণমূর্ত্তি কবন্ধ রাক্ষস রামহস্তে নিহত হইয়া শাপমুক্ত হইল এবং পূর্ব্বদেহ গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সে প্রস্থানকালে রামকে বলিয়া গেল,—আপনি মতঙ্গাশ্রমে শীঘ্র গমন করুন, তথায় সিদ্ধশবরী শ্রমণা তন্ময়ভাবে আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আপনার দর্শনে মুক্তিলাভ করিবে, এবং আপনাকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিবে।

রাম ও লক্ষ্মণ মতঙ্গাশ্রমে গমন করিলেন। চিরারাধিত ইষ্টদেবতাকে আসিতে দেখিয়া শবরীর আনন্দসাগর উচ্ছলিত হইল, তিনি উন্মত্তার ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন। হর্ষাবেগে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; তাঁহার হৃদয় ও কণ্ঠ স্ফীত ও বিকম্পিত করিয়া ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। শবরী সংজ্ঞালাভ করিয়া, পুলকিত দেহে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে রাম ও লক্ষ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া, তাঁহাদিগকে আসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাদের পাদপূত সেই সলিলে নিজের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বারংবার তাঁহাদের চরণপূজা করিলেন। শবরী সুদীর্ঘকাল উক্ত তপোবনে বাস করত,

রামায়ণে সবিস্তর লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ঐ দুই মূল হইতে গ্রহণ করিয়া তুলসীদাস উহা বকৃত রামায়ণে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

(২) শবরজাতি চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতির অন্তর্গত।

নিজে চাখিয়া চাখিয়া, যে ফলটী নিজের মিষ্ট লাগিত, তাহা অতি যত্নে ইষ্টদেবের জন্য রাখিয়া দিতেন। এক্ষণে চিন্তামণি-ধনকে সম্মুখে পাইয়া, চিরসঞ্চিত সেই সমস্ত ফল আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। আমি চণ্ডালকন্যা, আমার উচ্ছিষ্ট ফল ইষ্টদেবতাকে কিরূপে দিব, এ তর্ক তদীয় হৃদয়ে আদৌ উদয় হইল না। রাম ও লক্ষ্মণ পরম আদরে সেই সকল ফল ভোজন করিয়া অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়,—ঐ সকল ফল বহুকালাবধি সঞ্চিত হইলেও, অণুমাত্র বিকৃত হয় নাই। এ জগতে সর্ব্বোপরি প্রেমরূপ একটী দিব্য উপাদান আছে, যাহার সহিত মিশ্রিত হইলে, কস্মিন্‌কালেও কোনও পদার্থ বিকৃত হয় না।

রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর আতিথ্যলাভে পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিলে, শবরী কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, হে দয়াময়! আমার পরমগুরু, পরম কারুনিক মতঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রস্থানকালে আমাকে আদেশ করিয়াছেন,—"সনাতন পরমাত্মা দশরথ-গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুষ্কৃতিগণের সংহার ও সুকৃতিগণের রক্ষার জন্য, তিনি এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন। তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তদীয় আগমন প্রতীক্ষা কর। তিনি এস্থানে যাবৎ না আসেন, তাবৎ নিজ দেহ রক্ষা কর। তুমি তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া নিজ দেহ দগ্ধ করিলেই অক্ষয় অমৃতধামে গমন করিবে।" আমি সেই গুরুগণের আদেশে, আপনার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আজি গুরুবাক্য সফল হইল। হে ভগবন্‌! আপনার সাক্ষাৎ দর্শন আমার গুরুগণের ভাগ্যেও ঘটে নাই, মাদৃশী অধমার ভাগ্যে কিরূপে ঘটিল? আপনার স্বরূপ অপ্রমেয়, আপনি বাক্যমনের অতীত; আমি অবলা, মূঢ়া, হীনজাতি; আপনার দাস, দাসানুদাস, তাহার দাস, ইত্যাদিক্রমে নিম্ন নিম্ন শত সহস্র দাসপরম্পরার নিম্নতম দাসেরও দাসীত্বে আমার অধিকার নাই। আপনার সাক্ষাৎকারলাভের সম্ভাবনা কোথায়? হে দেবদেব! আমি স্তব করিতে জানি না, কৃপা করুন, ক্ষমা করুন। হে প্রাণময় প্রাণপুরুষ! হে অন্তঃসাক্ষিন্‌ অন্তঃপুরুষ! আমি ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, আপনি এ অধমার মনের কথা সকলি জানিতেছেন। এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রমণা বিহ্বলা ও বিচেতনা হইয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন।

কৃপাসাগর ভগবান্‌ রামচন্দ্র, শবরীকে সস্নেহে তুলিয়া কহিতে লাগিলেন;—"বৎসে! স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব, জাতি-নাম-আশ্রমাদির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, এ সকল আমার নিকট গণনীয় নহে। একমাত্র ভক্তিই আমার প্রীতির কারণ। যাহারা ভক্তিবিমুখ, তাহারা সহস্র যজ্ঞ করুক, দান করুক, তপস্যা করুক, বেদাধ্যয়নাদি করুক; কিছুতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে সংক্ষেপে-ভক্তিসাধনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—"নববিধ ভক্তিসাধনের প্রথম সোপান—সাধুসঙ্গ। দ্বিতীয় সোপান—ভগবৎকথালাপ। তৃতীয় সোপান—ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন। চতুর্থ সোপান—ঈশ্বরজ্ঞানে অকৈতব শ্রদ্ধার সহিত সদ্গুরুর উপাসনা। যমনিয়মাদি অবলম্বন পূর্ব্বক সতত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই পঞ্চম সোপান। ঈশ্বরপূজায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই ষষ্ঠ সোপান। শুদ্ধভাবে ভগবানের মন্ত্রোপাসনা সপ্তম সোপান। ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরাধিক ভক্তি ও পূজা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরবুদ্ধি, শমাদিসহকারে বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য, ইহাই অষ্টম সোপান। নবম সোপান—তত্ত্ববিবেক। এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ শেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যে যোনিতে, যে অবস্থায়, যে মুহূর্ত্তে জীবের এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মিবে, সে সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তিলাভ করিবে; সে সর্ব্বদুঃখের অতীত হইয়া, অশোক, অভয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিবে। হে বৎসে! তোমার ভক্তিগুণে আকৃষ্ট হইয়াই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।" অনন্তর শবরী রামচন্দ্রের চরণে বার বার বিলুণ্ঠিত হইয়া, রামমূর্ত্তি হেরিতে হেরিতে অগ্নিকুণ্ডে দেহ দগ্ধ করিয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন। রামকে বলিয়া গেলেন,—"হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অগোচর কিছুই নাই। তথাপি মা জানকীর সন্ধান বলিতেছি;—তিনি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় অবরুদ্ধা আছেন। আপনি ঋষ্যমূকে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ভগবান্ রাম, শ্রমণাকে যে নয়টী সাধনের কথা বলিলেন, মোক্ষমার্গের এ নয়টী সাধন বা সোপান পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে, প্রথম সোপানে উঠিলেই দ্বিতীয়টীতে উঠা সহজ হয়। সাধক ক্রমশঃ যতই ঊর্দ্ধগামী হইবে, ততই তাহার উত্থানের শক্তি ও বেগ বাড়িতে থাকিবে। পঞ্চম সাধনে যম-নিয়মাদির কথা আছে। যম-নিয়মাদি রাজযোগের আটটী অঙ্গ। যথা;—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি। ইন্দ্রিয় সকলের বহির্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া, অহিংসা, সত্যবাক্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রকৃতিস্থ করাকে 'যম' বলে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক, শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, আস্তিক্য, গুরুভক্তি, গুরূপদেশ-শুশ্রূষা, শ্রবণ, মনন, মীমাংসা, দান, হোম, পূজা প্রভৃতির অনুশীলনকে 'নিয়ম' বলে। 'আসন' পঞ্চবিধ, যথা;—(১) পদ্মাসন, (২) স্বস্তিকাসন, (৩) ভদ্রাসন; (৪) বজ্রাসন, (৫) বীরাসন। প্রত্যেক আসনের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। অধিকারীর ভেদে আসন পৃথক্ পৃথক্। আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রণালী

নিয়মিত এবং শ্বাসরোধশক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং দূষিত বায়ু প্রভৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দেহ রোগশূন্য হয়। ধ্যেয় বিষয়ে মনোনিবেশশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা, যোগীরা পানভোজন না করিয়াও বহুকাল জীবিত থাকেন। পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথা অনেকে শুনিয়াছেন। পঞ্জাবকেশরী রনজিৎ সিংহের আদেশে হরিদাসকে ৪১ দিন ভূগর্ভে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। পশ্চাৎ তাঁহাকে তুলিয়া দেখা গেল, তিনি নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার দেহের বা জীবনের কোনও হানি হয় নাই।

প্রাণায়ামের তিনটী প্রক্রিয়া যথা ;— পূরণ, কুম্ভক ও রেচন। নাসারন্ধ্র দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহ পূর্ণ করাকে 'পূরণ' বলে। সেই বায়ুকে দেহমধ্যে রোধ করিয়া রাখাকে 'কুম্ভক' বলে। অল্পে অল্পে সেই বায়ুকে নিঃসারণ করাকে 'রেচন' বলে। প্রাণায়ামে বহু অসাধ্য রোগের শান্তি হয়। অগ্নিসংযোগে যেমন স্বর্ণাদি ধাতু মলনির্ম্মুক্ত হয়, প্রাণায়াম দ্বারা তেমনি সমস্ত দেহধাতু মলনির্ম্মুক্ত হয়। শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে মনকে সংলগ্ন করাকে 'প্রত্যাহার' বলে। অদ্বিতীয় বস্তু পরব্রহ্মে মনকে ধারণ (দৃঢ় নিবদ্ধ) করিয়া রাখাকে 'ধারণা' বলে। সমস্ত চিন্তাপ্রবাহকে একীভূত করিয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থে নিবেশিত করাকে 'ধ্যান' বলে। আত্মাকে ব্রহ্মে সমাহিত করিয়া, 'সোঽহং' ভাবে অবস্থানকে 'সমাধি' বলে।

"ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো-
ধৃতিঃ।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণি স্থিতিঃ॥"

ভাবনা বা ভাবশুদ্ধিই সর্ব্বসিদ্ধির মূল। সদ্‌গুরু সাধু মহাত্মার সঙ্গে ও উপদেশে, মানবের চিন্তাপ্রবাহ আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি উর্দ্ধমুখী হইতে থাকে। যেমন স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণের ক্ষমতা নাই, তেমনি চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন কাহারও স্বরূপতত্ত্ব গ্রহণে ক্ষমতা নাই। সকলি সাধকের নিজের অনুশীলনসাপেক্ষ। সদ্‌গুরু বা সাধুসঙ্গ প্রথম উদ্দীপক ও পথপ্রদর্শক। চিত্তপ্রসাদ লাভের জন্য যোগশাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

(১) মৈত্রী, (২) করুণা, (৩) মুদিতা, (৪) উপেক্ষা। (১) মৈত্রী,—সর্ব্বভূতে মিত্রতা, অর্থাৎ শত্রু, মিত্র সমভাবে সকলেরি হিতকামনা। সর্ব্বভূতে এই মৈত্রীর পূর্ণবিকাসের নাম সমতা। সমতাই ভগবানের প্রকৃত আরাধনা; "সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"। মহাভারত মোক্ষধর্ম্মে সমতার এইরূপ লক্ষণ আছে ;—

"যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ
মম॥"

এক ব্যক্তি আমার দক্ষিণ বাহুতে স্নিগ্ধ

সুরভি চন্দন লেপন করিতেছে, অপর ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বাম বাহু ছেদন করিতেছে, ঐ উভয়েই আমার সমান প্রীতিপাত্র। (২) করুণা,—দুঃখিত প্রাণিমাত্রেরই দুঃখমোচনের জন্য হৃদয়ের ঐকান্তিক যত্ন। (৩) মুদিতা,—সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন। (৪) উপেক্ষা—পাপকার্য্যে অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটী ভাবনা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ জন্মে। চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে, দুঃস্বপ্ন, আবেগ, মলিনতা সকলি দূরীভূত হয়; চিত্ত নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় ধ্যেয় পদার্থে প্রদীপ্ত ভাবে জাগ্রত হইয়া থাকে।

"লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা স্বপ্নে সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যমানো ন
কম্পতে॥"

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম)

একান্তভাবে এই চারিটী ভাবনার অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মা নির্ম্মল হইয়া এক শান্তিময়ী আনন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সাধক সেই অবস্থায় উপনীত হইলে, সমস্ত রাজসিক ও তামসিক বিকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, বিশোকা জ্যোতিষ্মতী অবস্থাকে ধারণ করে, এই অবস্থাকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাব বলে।

কৃপাসাগর হরি, আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-যাতনায় প্রপীড়িত মানবগণের সম্মুখেই অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। মোহতিমিরে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া, আমরা সে অমূল্য পদার্থ দেখিতে পাইনা। তমসাচ্ছন্ন গৃহে দীপালোক প্রবেশ মাত্র যেমন সমস্ত অন্ধকার হরণ করে, সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করিয়া দেয়, সাধুসঙ্গ বা গুরূপদেশ তেমনি মোহাবরণ হরণ পূর্ব্বক সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিয়া তত্বদর্শনের সহায় হয়। তুলসী বলিতেছেন;—

"বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥
সতসংগতি মুদ-মঙ্গল-মূলা।
সোঈ ফলসিধি সব-সাধন-ফূলা॥"

—সৎসঙ্গ বিনা মানবের বিবেকদৃষ্টি খোলে না, ভগবৎকৃপাও সৎসঙ্গ বিনা লাভ করা যায় না। আনন্দ-মঙ্গলরূপ বৃক্ষের মূল—সৎসঙ্গ; জপ-তপ-দান-যজ্ঞ প্রভৃতি সাধন সকল এই বৃক্ষের পুষ্প, এবং মোক্ষ ইহার ফল।

সেশ্বর-সাংখ্য-প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণের মতানুবর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন;—

"পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈ—রপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়—মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং প্রাণভৃতামনুগ্রাহকশ্চ।"

(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

—ঈশ্বর, ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-বাসনাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়াও, স্বেচ্ছাক্রমে নির্ম্মাণ-শরীর (রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্টাদির রূপ) ধারণ করিয়া, লোকসমাজে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সংসাররূপ অঙ্গারে দহ্যমান জীবগণের প্রতি কৃপা-

প্রদর্শনই ঈশ্বরের ঐরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আমরা করুণাময়ের কৃপাসাগরেই ডুবিয়া আছি, ঘোর বিষয়-বিকারে আচ্ছন্ন হইয়াই সে অমৃতের আস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছি। তুচ্ছ রাজ্য-লোভাদি ভোগতৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া, ঈশ্বরের এ সুন্দর পবিত্র বিশ্ব-রাজ্যকে পাপময় শোণিতপঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছি। ভ্রাতা হইয়া ভ্রাতৃশোণিত পান করিতেছি। কত অল্প সময়ে কত অধিক প্রাণীর প্রাণসংহার করা যায়, ইহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া নিজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-গরিমার চূড়ান্ত উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছি। অহো! ইহাই মানব-দানবের পূর্ণ সভ্যতা!!!

যে জীবন বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়েও তাহার বিলয় নাই। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন, নিত্য সত্য মঙ্গলময়ের অঙ্গীভূত, এজন্য তাহা নিত্য সত্য ও মঙ্গলময়। বিশুদ্ধ হৃদয়ই প্রেমরাজ্যের পবিত্র সিংহাসন। বিশুদ্ধ হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন ;—

"তীর্থানাং গুরুবস্তীর্থং চোক্ষাণাং হৃদয়ং শুচি।
দৃশ্যানাং পরমং জ্ঞানং সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥"

—সদ্গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ, এবং সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর নাই।

তুলসীদাসের জীবনে দেখ। প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত কামনা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, লাভালাভ প্রভৃতি সকলি একটী অসার অনিত্য ক্ষুদ্র পদার্থ ভার্য্যারূপ আধারে সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নগামিনী স্রোতস্বতীর স্থায় তাঁহার চিন্তাপ্রবাহ ঐ ভার্য্যার দিকেই বহিতেছিল ; আর কোনও জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। সে সময় তিনি কামানলের জলন্ত চুল্লী-স্বরূপ। পদে পদে তাঁহার বিরহসন্তাপ, আবেগ, উৎকণ্ঠা ; পদে পদে ঈর্ষ্যা, উন্মাদ, প্রমাদ, বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতির ভীষণ আবর্ত্তে তিনি বিক্ষোভিত ও বিঘূর্ণিত। সে অবস্থায় মানবের শান্তি কোথায়? সেই পরিচ্ছন্ন মোহময় আধার ছাড়িয়া, তুলসীর হৃদয় যখন প্রেমময়ের সম্মিলনে দ্রবীভূত হইয়া, অনন্ত বিশ্বে সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি এক অপূর্ব্ব শান্তিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার জীবন, অক্ষয় অমৃতময় অবিকারী ভূমানন্দে পরিণত হইল।

তুলসীর জীবনে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যে, সে সকল ঘটনা মানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ অতীত। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। অসাধ্যসাধন মানব-শক্তির বহির্ভূত এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু যে মানবশক্তি ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে মানবশক্তি দ্বারা সকলি সম্ভব। বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে,—মন্বাদি প্রজাপতিগণ এক একটী বিশ্বকাণ্ডের

প্রথম স্থষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এ কথায় অবিশ্বাস করি কেন? তাঁহারা যদি ঈশ্বরের ভূতসর্জ্জনী শক্তি দ্বারা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা ভূতসর্জ্জনে অশক্ত হইবেন কেন? দেখিতেছি, একখানি মলিন অঙ্গারের (কয়লার) দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু সেই অঙ্গার যখন অগ্নিসংযোগে অগ্নিময় হয়, তখন কি তাহার দাহিকা শক্তি হয় না? তখন অগ্নিতে ও সেই অগ্নিময় অঙ্গারে ভেদ কি? "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (ক্রমশঃ)

---

# প্রণয়ে প্রমাদ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ স্বার্থের দাস। নরঘাতী দস্যু হইতে গৃহবিরাগী সন্ন্যাসী হইতে এ মর জগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্বার্থের পূজা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কেহ অধিক, কেহ অল্প। মানুষের এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে স্বার্থই প্রধান পরিচালক। আশা তাহার সহচরী। স্বার্থ তমোগুণান্বিত; স্বার্থের কুহকে যে একবার মুগ্ধ হয় তাহার হিতাহিত পরাপর জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়, সে সেই প্রিয় বস্তুর পরিতুষ্টি সাধনার্থ নিজ হস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতেও দ্বিধা জ্ঞান করে না। শাবন্ত বাবুও স্বার্থের সেই তামসী মায়ায় অন্ধ হইয়া প্রণয় বদনে নিজ দেশ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক দূর দেশে এক পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একজন অপরিচিতের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, আমাদের ঘরে বিবাহযোগ্য একটী সুন্দরী কন্যা আছে বটে কিন্তু, আপনি বলিতেছেন যে, আপনার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, হঠাৎ আমি সে কথায় বিশ্বাস স্থাপনা করিতে পারিতেছিনা, এই একটী প্রতিবন্ধক।

শাবন্ত—আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। বাতজ্বরে ছয় মাস ভুগিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি ইঞ্জিনীয়ারী চাকুরি করি। আমার হাতে কিছু টাকাও জমিয়াছে। আমি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সন্তান।

এইরূপ নানা কথা বার্ত্তার পর অপরিচিত ব্যক্তিটীর আত্মীয় কন্যার সঙ্গে শাবন্ত বাবুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

শাবন্ত বাবুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া পরম সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে বছর চারি অতীত হইল। একদিন শুক্লা পূর্ণিমার প্রদোষকালে মুক্ত চুলে স্বামীর কাছে উপবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে স্ত্রী কহিলেন, দেখ, তুমি সর্ব্বদা আমাকে এত ব্যস্ত রাখ যে, আমি চুলটা বাঁধিতেও অবসর পাই না।

স্বামী—কেন চুল বেঁধে দরকার কি? কামিনীকেশ গুচ্ছকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফল কি?

স্ত্রী—তোমার চোখে আমি এতই সুন্দর?

স্বামী—শুধু আমার চোখে কেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোকেও ত তোমাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে। বাস্তবিকই তুমি বড় সুন্দর ছুবুটি!

একটী বেলফুলের মালা সাম্‌নে পড়িয়াছিল, ছুবুটী সেই মালাটী দেখিতে দেখিতে কহিলেন, দেখ, তোমার প্রথমা স্ত্রীও দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন, না?

স্বামী—ওঃ কিছু না।

স্ত্রী—তবুত।

স্বামী—সে আকৃতি, প্রকৃতিতে ঠিক পেত্‌নির মত ছিল।

স্ত্রী—তাকে নিয়ে তুমি কতদিন সংসার করেছিলে?

স্বামী—ওঃ খুব অল্প দিন।

স্ত্রী—তার জন্য তোমার এখন কষ্ট হয় না?

স্বামী—না, না, কিছু না। তাকে আমি ভালও বাসি নাই, তার জন্য আমার কষ্টও হয় না।

স্ত্রী—আচ্ছা আমি মর্‌লে তুমি আবার বিয়ে করবে?

স্বামী—না না কখনো না, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না যে, আমি কি? আমার প্রেম সাগরের মত গভীর, আকাশের মত উচ্চ, পর্ব্বতের মত অচল। তুমি যে মুহূর্ত্তে মরবে, আমার প্রাণও সেই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাবে।

স্ত্রী—সত্যি?

স্বামী—সত্যি ছুবুটী! সত্যি। আমার প্রাণ তোমার নিকট বিক্রয় করেছি, তোমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তোমার তাই,—বলিয়া স্ত্রী স্বামীর বক্ষে হেলিয়া পড়িলেন।

স্বামী—এখন একটী সন্তানের মুখ দেখিলেই আমি বাঁচিতাম।

স্ত্রী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া লজ্জায় ও আনন্দে ভ্রমরভরস্পন্দিতা মাধবী লতাটীর ন্যায় মৃদু মন্দ কম্পিত হইতে লাগিলেন।

স্বামী—তোমাকে আমি অনেক রকম গহনা দিয়েছি, কিন্তু তুমি নিরলঙ্কারেই সুন্দর।

স্ত্রী স্বামীর বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন, সেই জন্যইত আমি গহনা পরিনা।

স্বামী—পর বা না পর গহনাগুলি তোমার একটা সম্পত্তি।

স্ত্রী—ওঃ দুর্গা! গহনা সম্পত্তির আবার কে আশা করে। স্ত্রীলোকের স্বামীই প্রধান সহায় ও সম্পত্তি।

স্বামী—সে কথা যাক, এখন একটা পান দাও।

স্ত্রী এক রেকাব সন্দেশ আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, তারপর এক ডিবা পান দিলেন।

স্বামী কিছু খাইয়া কিছু স্ত্রীর জন্য

রাখিয়া দিলেন; স্ত্রী লজ্জানম্র বদনে কহিলেন, ও কি? রোজ রোজ তোমার ঐ এক ঢঙ্।

স্বামী—প্রসাদ খাও।

স্ত্রী—ভাত, তরকারীতেই রোজ প্রসাদ খাই, আবার এ সন্দেশগুলি কেন; খাও তুমিই ও গুলি খাও। তখন স্বামী আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া স্ত্রীকে সন্দেশগুলি খাওয়াইলেন, স্ত্রী অনিচ্ছা, ইচ্ছা, সুখ, ও অভিমান মিশ্রিত মনে সন্দেশগুলি খাইলেন।

এই ভাবে দিন চলিল, স্ত্রী ভাবিলেন, আমার স্বামী আমাকে যেমন ভাল বাসেন এমন কোন স্বামীই বাসিতে জানেন না। স্বামী ভাবিলেন, আমার প্রাণে যেমন ভালবাসা এমন ভালবাসা অন্য কাহারো প্রাণে নাই।

শাবন্ত বাবু বদলি হইয়া বহু দেশ দেশান্তর বেড়াইলেন, বহু টাকা উপার্জ্জন করিলেন। সহধর্ম্মিণী স্ত্রীলোকের কণ্ঠমালার ন্যায় অনুদিন অনুক্ষণ কণ্ঠে দুলিতে লাগিলেন, এই ভাবে দুবুটী কুড়ি পঁচিশ বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সন্তানবতী করিলেন না।

আজ বৈশাখ মাসের শুক্লা পূর্ণিমার সায়ং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে ফুলের বাগান। সামনে নিম্ব বৃক্ষ, পশ্চাতে অশ্বত্থ গাছ। এদিক্ সেদিকে রসাল তরুনিচয় ফুল, ফলে শোভমান। পরিষ্কার জোছনা। সুবাসিত বায়ু। পিক-ঝঙ্কার-মুখরিত নৈশ প্রকৃতি। শাবন্ত বাবু মাঝখানে একটী মাদুরে শয়ন করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার স্ত্রী মলিন বদনে, মলিন বসনে, স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী সন্দিগ্ধমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমার এ বেশ কেন দুবুটী!

স্ত্রী—একটী কথা শুনিতেছি।

ভয়ে স্বামীর মুখ শুখাইল তিনি ভীত হইয়া কহিলেন, কি?

স্ত্রী—আমার অগোচরে তুমি নাকি আবার বিবাহ করিয়াছ? এই বুড়া বয়সে।

স্বামী—কোথায় শুনিলে?

স্ত্রী—এই দশ জনের মুখে। কুকথা বাতাসের আগে ধায়।

স্বামী—না, ও সব মিথ্যা কথা।

স্ত্রীও তাহাই বুঝিলেন। তিনি জানিতেন স্বামীর উপর সন্দেহ করিলে ধর্ম্মের হানি আছে।

শাবন্ত এখন প্রাচীন হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীরও বয়স হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এখন বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, কখনো ধর্ম্ম চর্চ্চা, কখনো ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখনও আহারাদির পর অল্প বিশ্রাম করিয়া দুইজনে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

এখনো রাত্রি দুপ্রহর অতীত হয় নাই, ফুলের উপরে, ফলের উপরে, পাতার উপরে, গাছের উপরে, ভূমির উপরে, নদীতটে, ও লহরীতে পূর্ণিমার জোছনা মধুরিমা বিকীর্ণ করিতেছিল। অদূরে আম্র-

বনে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া কোকিল-কাকলী উত্থিত হইতেছিল। সুরভি বায়ু মৃদু নিনাদ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল। শাবন্ত ও তাঁহার স্ত্রী পরিষ্কার একটী মাদুরে উপবিষ্ট। বিশদ জোছনালোকেও তাঁহারা দীপ জ্বালিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। সহসা একটী মানুষের ছায়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। তাঁহারা দুইজন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে অবগুণ্ঠন ছিল, তিনি তাহা মুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

শাবন্ত একবারমাত্র স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া রহিলেন। আর একটীবার মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী আগন্তুকা স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা! তুমি কে?

স্ত্রীলোকটী হাত নাড়িয়া কহিলেন, তুমি আমাকে মা বলিও না, তোমার আমি সতীন, আমি তোমার স্বামীর প্রথমা স্ত্রী। আমার নাম জবা কুমারী। তুমি যাহা যাহা শুনিয়াছ? সে সমুদয়ই মিথ্যা ও প্রতারণা, আমি আকৃতিতেও পেতিনী না, প্রকৃতিতেও পেতিনী না। স্বামী আমাকে লইয়া খুব অল্প দিনও সংসার করেন নাই, খুব বেশী দিনই সংসার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি আমাকে খুবই ভাল বাসিতেন। আমি মরি নাই, এই দেখ এখনও বাঁচিয়া আছি। অর্থাভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছি। স্বামীকে বড়ই ভাল-বাসিতাম। স্বামীর মনে কষ্ট হইবে ও তাঁহার সুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এত-দিন তোমাদের কাছে আসি নাই। আজ আসিলাম স্বামীর পদধূলি লইতে ও তোমাকে সাবধান করিতে, কারণ এ মন্দভাগিনীর দুঃখময় জীবনের শীঘ্রই অবসান হইবে।

ইদানীং আমার কোন জিনিসেরই অভাব ছিল না। কেবল প্রথম যৌবন ও সন্তানের অভাব হইয়াছিল। এই দুই রত্ন অভাব তোমাতেও অনুভব করিতেছি। সাবধান ভগ্নি! সাবধান, দেখিও আমার মত দুর্দ্দশায় পড়িতে না হয়। একদিন এ ভালবাসায় আমিও ভুলিয়াছিলাম। আজ আমার দুর্দ্দশা অবলোকন কর। জবা বিদ্যুতের মত স্বামীর পদতলে পতিত হইলেন ও স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

বধূটী অল্পক্ষণ হতভম্বের মত রহিলেন। পরে স্বামীর অধোবদনের দিকে চাহিলেন। তাঁহার তখনকার মনোভাব বর্ণনা করা সুকঠিন। তখন তিনি স্বামীকে সত্যবাদী দেবতা ভাবিতেছিলেন, অথবা মিথ্যাবাদী পিশাচ ভাবিতেছিলেন, জবাকে সত্যবাদিনী দেবী অথবা মিথ্যা-বাদিনী পিশাচী ভাবিতেছিলেন, তাহা আমি নির্ণয় করিবনা, বিশুদ্ধচরিত্রা পাঠিকাগণ ইহা নির্ণয় করিয়া লইবেন।

স্বামী অধোবদনেই রহিলেন, তাঁহার আর মুখ তুলিবার সাহস হইল না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া স্ত্রী কহিলেন, দেখ, আমার যখন বিবাহ হয় তখন তোমার প্রথমা স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এইরূপ বলিয়াছিল।

স্বামী—এরূপ না বলিলে তোমার আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন কি ?

স্ত্রী—আমার নিকটেও এইরূপ বলেছিলে।

স্বামী—নইলে নিরুদ্বেগে সংসার করিতে পারিতাম কি ?

স্ত্রী—তুমি যে বলেছিলে রূপে গুণে পেত্নীর মত। কিন্তু তাঁহাকেত রূপে গুণে দেবীর মত দেখিলাম।

স্বামী—তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য ও সব বলেছিলেম।

স্ত্রী—কেন তুমি এরূপ করিয়াছিলে ?

স্বামী—তাহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায়।

স্বামীর কথাগুলি স্ত্রীর বুকে আসিয়া শেলের মত বিদ্ধ হইল। স্ত্রী বিমর্ষ হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

স্বামী তখন স্ত্রীর নিকটে বসিয়া বাতাস দিয়া মধুর কথা কহিয়া স্ত্রীকে শান্ত করিলেন। স্ত্রীও পতিভক্তি বশতঃ পূর্ব্ববৎ সরল মনে গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। এবং এই বলিয়া মনকে বুঝাইলেন—

"পতি করে নানা দোষ,পতি করে নানা দোষ;
তা বলে কি পতিপ্রতি সতী করে রোষ"।

ক্রমশঃ।

---

# গীতার ব্যাখ্যা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

## কর্ম্মযোগ।

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি প্রকৃত যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্মই তাহার অবলম্বন। আত্মার প্রসাদ, প্রগাঢ় ও অটল শান্তি-লাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। যে ব্যক্তির এই যোগসিদ্ধি লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সে মানব ধন্য। ইহাই কর্ম্ম-যোগের পরিসমাপ্তির অবস্থা—যোগসিদ্ধ সেই মানবের আত্মার ভাব এই—

নিষ্কম্প নিবাত স্থলে—দেউটীর মত,
আত্মার বিশ্বাসদীপ জ্বলে অবিরত।
জ্ঞান কি বিজ্ঞানে তৃপ্ত নহে সেই মন।
ধূলি ও কাঞ্চন করে সমান গণন॥

কবিও এই ভাবেই তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন—

"আছে কি সুখ জীবনে প্রাণ সখা বিনে॥
কর ধন মান সমর্পণ দীননাথের শ্রী চরণে॥"

এইরূপ শান্ত সমাহিত কর্ম্মযোগীর অবস্থাই মানবের আরাধ্য—এই ভাবে বিশ্ব সেবাব্রতে অনুক্ষণ সমস্ত শক্তি নিয়োগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা ও ভগবানের

প্রিয় কার্য্য কি হইতে পারে? পার্থ করপুটে বলিলেন,—ভগবন্! মানবচিত্ত দুঃখ-বিপদাঘাতে পবনতাড়িত সাগরের ন্যায় সততই যে উদ্বেলিত ও চঞ্চলভাব ধারণ করে, তাহা প্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া এ অভাজনকে কৃতার্থ করুন। এই প্রকার উদ্বেলিত আত্মা কি সত্যই বায়ুতাড়িত জলদখণ্ডের ন্যায় উভয় লোক ভ্রষ্ট হইবে? ভগবান্ বলিলেন—

ইহপর লোকে আত্মা নহে বিনাশিত।
আমার কৃপায় আত্মা সদা সুরক্ষিত॥

পাপী তাপীর বন্ধু ভগবান্ কি আশাবাণী শুনাইয়া অভাজন সন্তানকে অকূলে রক্ষা করেন! তমসাচ্ছন্ন জগতে আশালোক দেখাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে বলীয়ান্ করেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ!

ওই মোক্ষ পথ জেনো বিধাতা-প্রসাদ।
কেন শোক মোহে ম্লান কেন অবসাদ।
ও আনন্দ লোকে সেই নিত্য লভে স্থান।
কিবা জ্ঞানী আর কিবা দুষ্টমতি জন॥

—শুধু এই দুইটী পংক্তি দ্বারা পাপী-তাপীর একমাত্র পরিত্রাতা, মহান্ ও পরিপূর্ণ কৃপাসিন্ধু যে অভয়বাণী পাপীর কর্ণে শুনাইতেছেন, কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ আশার কথা শুনাইতে সমর্থ তাহা জানিনা।

সকল ভূতেতে আমি—আমা মাঝে ভূত।
সর্ব্বত্র আমার সত্তা জীবে অনুভূত॥
সুখে দুঃখে স্থির যেই শ্রেষ্ঠ যোগী হন,
ধরার পরীক্ষা গণে ধূলার সমান॥

পার্থ করপুটে বলিলেন,—"ভগবন্! সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি পরব্রহ্ম ভুবনেশ্বরের প্রকৃতি কিরূপ?" ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ভূমি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি ও মন আমার প্রকৃতি। ইহারা "অপরা প্রকৃতি" নামে অভিহিত, জীবভূত অন্য যে পরা প্রকৃতি আছে, তাহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে—

সকলের শ্রেষ্ঠ আমি জানিও ভারত!
আমাসূত্রে বিশ্ব গাঁথা মণিহার মত॥

অর্থাৎ নানা বর্ণবিশিষ্ট মণি যেমন সূত্রে গ্রথিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করে, হে কৌন্তেয়! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমা সূত্রে গ্রথিত হইয়া মণিহারতুল্য শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশপূর্ব্বক ভাবুকের নয়ন মন বিমোহিত করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

---

# আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪) আমাদের কৃষির খুব দুরবস্থা, কিন্তু শিল্পের অবস্থা বোধ হয় তাহা হইতেও মন্দ। বিদেশী প্রতিযোগিতায় কৃষির আজও বিলয় হয় নাই, কিন্তু শিল্প একরূপ বিলুপ্ত বলিলে চলে। প্রাত্যহিক ব্যবহারের অধিকাংশ জিনিষ এখন বিদেশ

হইতে আমদানি হয়। আজ পল্লিগ্রামে খুব দরিদ্র চাষার ঘরেও বিদেশী দেশালাই, বিদেশী বস্ত্র, এবং বিদেশী এনামেলের দুই চারিটা তৈজস পাত্র দেখিতে পাইবে। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কৃষি শিল্পাদির উন্নতির জন্য এবং নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া আনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবল বিদ্যা শিখাইয়া আনিলে কি হইবে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট দেশের কতকগুলি কৃতবিদ্য লোককে বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আনেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের কয়জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া চোর ডাকাতের বিচারে ব্যাপৃত হইলেন। ইঁহাদের দুই একজন কৃষিবিভাগে কাজ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শুনিতে পাই তাঁহারা আর ঐ বিভাগে থাকিবেন না। আর এক কথা। গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ দেশের কি কাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সেই জন্য বলি, লোক শিখাইয়া আনিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া চাই। তাহা করিতে হইলে যৌথ কারবার ও কল কারখানা স্থাপন দরকার।

যৌথ কারবার করিতে আমরা আজও শিখি নাই, এবং যতদিন না শিখিব তত দিন আমাদের অবস্থোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বিশ্বাস চাই এবং পাণ্ডাদের মধ্যে বিশেষ সাধুতা চাই। আমরা স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ। আমাদের বিশ্বাস অকর্ষণ করা বড় সোজা ব্যাপার নয়। পাণ্ডারা বিশেষ সতর্কতার সহিত না চলিলে বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। সকলেই জানেন ব্যবসা করিতে গেলে টাকার আবশ্যক। অনেক ব্যবসায়ে এত টাকার আবশ্যক যে দুই এক জন তাহা যোগাইতে পারেন না বা ভরসা করেন না। অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। কাজেই যৌথ কারবারের কতকগুলি দোষসত্ত্বেও ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রধান দেশে উহা খুব প্রচলিত। যাঁহারা যৌথ কারবারে টাকা খাটাইবেন তাঁহাদের এক কথা মনে রাখা চাই। বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত কাজ করিলেও ব্যবসায়ে কখনও কখনও, বিশেষতঃ নূতন নূতন, অকৃতকার্য্য হইতে হয়। সেই জন্য তাঁহাদের কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য এটুকু যাঁহারা করিতে চান না, তাঁহাদের কোন যৌথ কারবারে হাত না দেওয়াই ভাল। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" ইহা কোন কালে সম্ভবপর হয় নাই এবং হইবে না।

আজ কাল কলকারখানার প্রাদুর্ভাব সভ্য জগতে বড় বেশী। মানুষের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ এখন কলে প্রস্তুত হয়। কলে জিনিষ প্রস্তুত হইলে বড় কম খরচে হয়, এবং সেই জন্য উহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। কাজেই আমা-

দের মধ্যে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে পাটের কল আজ কাল অনেক হইয়াছে; কিন্তু ইহার কয়টী দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত? কলিকাতা অঞ্চলে অনেকগুলি তেলের কল দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আমাদের নিজেদের। দেশে আর যে সব-কল কারখানা আছে তাহাদের অধিকাংশের সত্বাধিকারী সাহেব। সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মী মিল আমরা কিনিয়াছি, দুই একটী সাবান প্রভৃতির কারখানা খুলিয়াছি, এবং দুই চারিটা জিনিষ তৈয়ারির জন্য কল কারখানা খুলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু দেশে যখন ৫।৭ কোটী লোকের বাস, তখন কতগুলি বঙ্গলক্ষ্মী মিল খুলিলে তবে আমরা দেশের লোকের লজ্জা নিবারণ করিতে সক্ষম হইব? কাপড়ের কল ছাড়া আরও কত কল আবশ্যক। অন্য দেশে যে সব জিনিষ কলে হয়, আমাদের দেশে তাহা তৈয়ারি করিতে হইলে বোধ হয় কল ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দেশালাই প্রস্তুত করিতে হইলে কল চাই; লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে কল চাই; আরও অনেক বিষয় কলের আবশ্যকতা আছে। পুথি বাড়িয়া যায় বেশী বলিবার দরকার নাই।

অর্থাগমের ও উন্নতির অনেক পথ বিদেশীয়েরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বাঙ্গালার কোন কোন অংশে পাথুরিয়া কয়লা প্রচুর। অধিকাংশ খনি কিন্তু সাহেবদের হাতে। বাঙ্গালীর চা বাগান কয়টা আছে? এই সব ব্যবসায়ে দেশের মুটে মজুর ও অন্য শ্রমজীবী অনেক খাটে বটে, কিন্তু ইহাদের পরিচালন বিদেশীয়েরা করেন এবং লাভ সব বিদেশে চলিয়া যায়। আর এক কথা। দেশের বহির্বাণিজ্যও একরূপ বিদেশীয়দের একচেটিয়া। বাঙ্গালী সওদাগর কয় জন আছেন? কয়খান জাহাজের অধিকারী বাঙ্গালী? যাহা হউক, এ সব লইয়া বেশী বাক্যব্যয় নিরর্থক। এখন আমাদের দরকার চেষ্টা করা। চেষ্টার পথে যে নানা বাধা বিঘ্ন আছে তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার কেহ নাই। একরূপ আমরা অকূল পাথারে। খুব দৃঢ়তা ও সতর্কতার সহিত কাজ না করিলে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিব না। অবস্থা বড় সঙ্গিন্। কিন্তু হাল ছাড়িলে চলে কৈ? তাহা হইলে রসাতল ছাড়া আমাদের আর গম্য স্থান নাই।

কলকারখানার একটা প্রধান দোষ এখানে উল্লেখ যোগ্য। যেখানে কল সেইখানে উহাতে কাজ করিবার জন্য অনেক নর নারীর একত্র সমবায় ঘটিয়া থাকে। ইহার এক অবশ্যম্ভাবী ফল মানব চরিত্রের অবনতি। পাটের কলে যে সব লোক কাজ করে তাহাদের নৈতিক অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে হইবে না। তাহাদের দৈহিক অবস্থাও সাধারণতঃ

ভাল নয়। কলকারখানার এই মহাদোষ উপলব্ধি করিয়া অনেক মনীষী ব্যক্তি ইহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, যে সব জিনিষ লোকে আপন আপন গ্রামে বসিয়া পরিজনবর্গের সাহায্যে তৈয়ারি করিয়া লাভবান্ হইতে পারে, সমাজের মঙ্গলার্থে সেই সব জিনিষ প্রস্তুত করণের জন্য কলের প্রচলন যত কম হয় ভাল। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব প্রমুখ কতকগুলি চিন্তাশীল লোক বলেন যে, উৎকর্ষিত তাঁতের ব্যবহার প্রচলিত হইলে দেশের তাঁতী প্রভৃতিরা এখনও হাতে কাপড় বুনিয়া বেশ দশ টাকা উপায় করিতে পারে। তাহাদিগকে অবশ্য চিরাগত প্রথা পরিত্যাগ এবং নূতন উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু একটু বুদ্ধি চালনা করিয়া কাজ করিলে কাপড় বোনা ব্যবসায়ে তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। কথাটা ঠিক্ কি না, সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক, এবং ঠিক্ হইলে গ্রহণ করা উচিত। কলকারখানার বিষময় ফল যদি কতক পরিমাণেও আমরা পরিহার করিতে পারি, তাহা হইলে লাভ বড় কম হইবে না। তাঁহারা আর এক কথা বলেন, শিল্পের অবনতি হওয়া দেশের বড় দুর্ভাগ্য। যে সব কাজ হাতে হয়, তাহাতে শিল্প চাতুর্য্য বেশ দেখান যায়, এবং হাতে বোনা কাপড়, গালিচা, শাল প্রভৃতি শিল্পচাতুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের জন্য ভারত চিরকাল জগতে বিখ্যাত। হাতে বোনা ব্যবসা যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে যে শিল্পচাতুর্য্য আমাদের এক প্রধান গৌরবের কারণ, এবং যাহা একরূপ লুপ্তপ্রায়, তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ হইবে। কথাটা বড় গুরুতর। এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এইটুকু বলিতে চাই যে, সমাজনেতৃগণের এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিষয়টা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের মধ্যে একটী নেতৃদল গঠিত হওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত নেতা না থাকিলে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বড় কাজের ত কথাই নাই। যেমন দেশে খাটিবার লোকের প্রয়োজন, ভাবিবার ও পরিচালন করিবার লোকেরও সেইরূপ প্রয়োজন। নেতা হইতে গেলে অনেকগুলি গুণ থাকা চাই। লোক-আকর্ষণী শক্তি না থাকিলে নেতা হওয়া যায় না, এবং উৎকৃষ্ট গুণই লোক আকর্ষণ করে। মানসিক গুণের মধ্যে কল্পনাশক্তি, পরিণামদর্শিতা, বিচারশক্তি প্রভৃতি থাকা চাই। কিন্তু একজন অধিনায়কের নৈতিক গুণ থাকা বড় বেশী আবশ্যক। সাহস, উদারতা, সহানুভূতি, সত্যপ্রিয়তা, হৃদয়ের কোমলতা, একাগ্রতা, নিস্বার্থতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত না হইলে অধিনায়ক হইতে সক্ষম হওয়া যায় না। কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ যদি এই সব গুণসম্পন্ন হন, তাহা হইলে লোকের মন সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যে

পরিমাণে দেশে এইরূপ লোক জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে নেতার অভাব দূর হইবে। অতএব সকল দেশভক্ত পিতামাতার চেষ্টা করা উচিত, যতদূর তাঁহাদের আয়ত্তাধীন,, ততদূর তাঁহাদের ঐ সব গুণ সম্পন্ন হয়। সকলেই জানেন সাধিলেই সিদ্ধি। এইরূপ কতকগুলি লোক দেশে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইবেন।

( ক্রমশঃ )

---

## বর্ষ বিদায়।

Another year, another year  
The unceasing rush of time  
sweeps on,  
Overwhelmed in its surges  
disappear,  
Man's hopes and fears for ever  
gone.

পুরাণ চলিলে,　　নবীনে ডাকিলে,  
অভ্যর্থনা শুনি এই।  
বছর চলিলে,　　অশ্রু যে বহালে,  
বন্ধু তোমা ভাবি তাই॥  
অনেক সয়েছি,　　অনেক লভেছি,  
সাক্ষী ছিলে তুমি ভাই!  
ভয় প্রাণে বল,　　আঁধারে সম্বল,  
হয়েছিলে ভুলি নাই॥  
ভূত সিন্ধু জলে,　　ডুবিতে চলিলে,  
উঠিল কালের ঢেউ।  
বিচুর্ণ পরাণ,　　অবিশ্বাসে ম্লান,  
ভুলিতে কি পারে কেউ?  
শুধু আঁখি ঝরে,　　শুধুই আঁধারে,  
নিশি দিন মগ্ন রই।  
সমুখে—আনন্দ-পূরিত, রাজ্য সুবিস্তৃত,  
আছে তাহা ভাবি কই?  
নিশা পোহাইলে,　　ও নিশান তুলে,  
ও পারে যাইব সবাই।  
ক্ষণেকের তরে,　　না কাঁপিব ডরে,  
অমরার যাত্রী হই।  
হবে অশ্রু দূর,　　শুধু সুমধুর,  
দুন্দুভি বাজিবে কাণে!  
অবশ পরাণ,　　লভিবে চেতন,  
পাইয়ে বাঞ্ছিত জনে॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

---

## সংসার গহন।

এই মহা ইন্দ্রজালময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিত্য নানা সুখ ও দুঃখের ঘটনাধারায় মনুষ্যগণ পরিচালিত হইতেছেন, এবং সুখ অপেক্ষা দুঃখই সমধিক। তন্মধ্যে সকল দুঃখ যাতনা অপেক্ষা জীবগণ মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করেন। অথচ

কোন কষ্ট হইলেই আমরা তৎক্ষণাৎ অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত মৃত্যু কামনা করি ও যখন সেই মহাকাল উপনীত হইয়া আমাদের জীবনের প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর প্রিয়তমজনকে হরণ করে, তখন কালকূট ভরা ভুজঙ্গের দংশন অপেক্ষা অধিক জ্বালা অনুভব করি; সে দুরারোগ্য, অনারোগ্য বেদনা অবর্ণনীয়। উহার কোন ঔষধ নাই, কোন প্রতীকার নাই, কেবল একমাত্র জ্ঞানবারি সিঞ্চিত হইলেই সে শিখা নির্ব্বাণ হয়।

উক্ত পরমজ্ঞান জগতে আয়াসসাধ্য। যখন মানবের মায়াতরু ঝরিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের আশা নষ্ট করিয়া দেয়, তৎকালে জীবের অন্তর্দ্দশা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই প্রেমময় সুখাবাস সংসার, ঘোর গহনস্বরূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু তৎকালে নিরুপায়ের উপায় চক্ষে দেখিতে পাই না। শোক মোহাচ্ছন্ন হৃদয়, তমোময় নভোমণ্ডলের ন্যায় অন্ধকারব্যাপ্ত হইয়া থাকে, আর সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন নীরদরাশি ভেদ করিয়া কেবল প্রবল বারিধারা পতন হয়। যদিও মানবের শোকাশ্রু সেই দুর্ব্বিসহ যাতনার আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে, তথাপি তাহাতে উপকার হয় না; তৎকালে একমাত্র ভগবৎকৃপা আমাদের ক্ষুব্ধচিত্তকে সংযত করিতে সক্ষম হয়। এস্থলে একটী প্রাচীন কথা বিবৃত করিব। যৎকালে অন্ধনৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রপৌত্রাদি নিধনে মহাশোকান্বিত হইয়া চিত্তবিকার প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে সুধার্ম্মিক বিদুর মহর্ষিগণ কথিত বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—

মহারাজ শ্রবণ করুন! এই সংসার ভীষণ গহনস্বরূপ, তাহায় একটী উপমা দিতেছি।

একদা এক ব্রাহ্মণ পথভ্রান্ত হইয়া ভীষণ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল এক বনে গিয়া পড়েন। ক্রমেই বিজন অরণ্য ভ্রমণে তাঁহার নিতান্ত ত্রাস জন্মিল, অবশেষে প্রাণসংশয় চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া বহির্গমনের শত উপায় করিয়াও নিষ্ফল হইলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে এক রমণীর সন্নিধানে আসিয়া পড়িলেন। সে উঁহাকে দেখিবামাত্র ভুজপাশে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিল। ঐ ভীষণা নারীর বাগুরা দ্বারা সমগ্র কানন পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তথায় উন্নত শৈলাকৃতি মহানাগগণ ফণা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। ব্রাহ্মণ কোনক্রমে উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া মহাভীত-অন্তঃকরণে বেগে ছুটিতে লাগিলেন। চারিদিকে শ্বাপদগণবেষ্টিত কণ্টকিত বনপথ অতিক্রম করিতে গিয়া এক কূপ মধ্যে নিপতিত হইলেন। কিন্তু একবারে সলিল মধ্যে পতিত না হইয়া পনস ফলের ন্যায় তন্মধ্যস্থিত বল্লীমধ্যে ঊর্দ্ধে পদ ও নিম্নে মস্তক হইয়া আবদ্ধ হইলেন। উক্ত কূপের মুখবন্ধ পট্টোপরি, ছয় মুখ, দ্বাদশ চরণধারী একটী হস্তী দণ্ডায়মান ছিল। সেই হস্তী বৃক্ষলতাদিতে সমাবৃত হইয়া গমন করিতেছিল, এবং সেই পাদপে নানাবিধ ভয়াবহ মধুকর সকল প্রশাখা

সমুদয় অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে নিবাস করিয়া, মধু সঞ্চয় করত অবস্থিতি করিতেছিল। সেই মকরন্দ পানে বালকও আকৃষ্ট হয়। সুমিষ্ট মধুপানে ভ্রমরেরা উন্মত্ত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে। ব্রাহ্মণ বিপাকে পড়িয়া শতধা ক্ষরিত মধুপানে প্রয়াসী হইলেন। সেই মধুপানে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত হইলনা বরং ক্রমেই অতৃপ্তি বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু অনিচ্ছা হইলনা। যেহেতু ক্ষুধার্ত্ত পিপাসার্ত্ত প্রাণের আর কোন উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন দুইটী মূষিক সেই বৃক্ষকে অনবরত ছিন্ন করিতেছিল।

এরূপ দুর্গম বনে ভয়াল জন্তুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, ভীষণা রমণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত, পরে নাগ ও কুঞ্জর হইতে মহাভয়প্রাপ্ত, মূষিকগণ হইতে ও মধুকর দ্বারা ক্ষিপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ অতীব শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন।

এই আখ্যান শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য এরূপ মহৎ দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যেও ব্রাহ্মণের মধুপানের অনুরাগ কেন জন্মিল? কি জন্য বা তাহার এতাদৃশ ধর্ম্মসঙ্কট অবস্থা ঘটিল। এই সমুদায় না জানিলে আমার মন শান্ত হইতেছেনা।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষবিদ্ পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মনুষ্য সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুযায়ী ফল ভোগ করে। এই যে দুর্গম বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, উহাই মহাসংসারস্বরূপ, সেজন্য সংসার গহন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বনস্থিত ব্যালগণ ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই বনে যে ঘোররূপা কামিনী অধিষ্ঠান করেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই শক্তি ও রূপবিনাশিনী জরা বলিয়া থাকেন। বনমধ্যে যে কূপ উহাই মানবগণের দেহ, এবং ঐ যে মহানাগ তিনি দেহবিনাশী মহাকাল-স্বরূপ। কূপমধ্যে যে বল্লরী সংলগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ঝুলিতেছিলেন, তাহাই শরীরিগণের জীবিতাশা। আর কূপের মুখবন্ধস্থলে যে হস্তী, তাহাই সংবৎসরস্বরূপ, তাহার ছয়মুখ ষড়্ঋতু, দ্বাদশপদ বার মাস বলিয়া জানিবে। যে সমস্ত মূষিক ও সর্পগণ পাদপকে নষ্ট করিতেছে, উহা দিবারাত্রি স্বরূপ, এবং যাহাদিগকে মধুকর বলা হইয়াছে, উহা কাম নামে অভিহিত।

ধীরগণ এইরূপে সংসারচক্রের পরিবর্ত্তন জ্ঞান করেন, যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা সংসার চক্রের পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হন।

নিদারুণ পুত্রশোকাতুরা কুরুকুলপতির কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিষম মোহ আসিয়া অতীতের চিত্র প্রাণে জাগাইয়া দিল। এই ভীষণ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি জয়ী হইতে পারে, সেই মুক্ত ও শুদ্ধ।

শ্রীমনোরমা রচয়িত্রী।

# পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।*

১। অপামার্গ (আপাঙ্) মূল ৵০ এক আনা পরিমাণ শীতল জলসহ বাটিয়া সেবন করিলে বিসূচী (কলেরা) নিবারিত হয়।

২। জায়ফল ¼ সিকি তোলা অর্থাৎ ।০ চারি আনা, কর্পূর সিকি তোলা, যোয়ান সিকি তোলা, মটকুড়ার (আটসেওড়ার) পাতা (কীটদষ্ট না হয়) ১টী (উহার শির ফেলিয়া লইতে হইবে) শঠীর স্বরসে শিলে মর্দ্দন করিয়া ৩টী বটিকা করিবে। প্রত্যেক দাস্তের পর শীতল জলসহ ১ বটিকা সেবন করিবে। পিপাসায় শীতল জল সেবন করিতে দিবে। বিসূচী রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায় বিফল হইতে দেখা যায় না।

৩। কৃমি ও অম্লশূলে কুল খড়ি ৪ চারি তোলা, শ্বেত চন্দন চূর্ণ ৪ চারি তোলা এক সঙ্গে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এক এক বটিকা সকাল ও সন্ধ্যায় পালিতামাঁদার (তেপালিতার) পাতার রস ও মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। অরহর পাতার রস ২ দুই তোলা পরিমাণ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেবন করিলে পাণ্ডু (নেবা) দূরীভূত হয়। বেশী দিন সেবন করিলে মূত্রাধিক্য রোগ নিবারণ হয়। পাণ্ডুরোগে ৩।৪ দিন মাত্র ব্যবহার করিতে হয়।

৫। কদ্বেৎ বেলের শাঁস ২৷৷০ আড়াই তোলা, হিরাকস চূর্ণ ৵০ দুই আনা, আর মধু ১ এক তোলা, এক সঙ্গে অবলেহ করিলে প্রবল হিক্কা নিবারণ হয়।

৬। কুঁচী মৎস্য (পূর্ব্ব বঙ্গে ইহাকে 'ধপে' মাছ বলে) পানমরীচের ডগা ৫।৬টী, এক সঙ্গে ঝোল করিয়া খাইলে এক দিবসেই খোস পাঁচড়া দূরীভূত হইবে। (পানমরীচকে পূর্ব্ব বঙ্গে বিষকাঁটালী বলে)।

৭। অল্প পরিসর টাকে আকন্দপুষ্প ঘর্ষন করিলে ৫।৭ দিবসের মধ্যে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হইবে।

---

* পাঁচন ও মুষ্টিযোগ প্রকরণে যে সকল ঔষধের কথা লিখিত হইতেছে, তাহা পড়িয়া ও সেইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়াছেন। হঠাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে কোন রোগ উপস্থিত হইলে এবং তৎকালে চিকিৎসার উপায় না থাকিলে গৃহস্থেরা এই পাঁচন ও মুষ্টিযোগ দ্বারা মহোপকার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। গৃহস্থ মাত্রেরই এই সকল ঔষধের কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ, শাস্ত্রজ্ঞ, বহুদর্শী, নির্ম্মলচরিত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই সকল অনায়াসলভ্য অমূল্য ঔষধের বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছি, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ। কেহ সুপ্রবীণ, বিশুদ্ধ চিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাইতে অনুরোধ করি। তাঁহার ঠিকানা ১২।১।১ নং বেণিয়াটোলা লেন, পোঃ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

# নূতন সংবাদ।

১। ভারতের সীমান্তে মোমিনদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। আমীরের প্রজা আফ্রিদিরা ইহার মধ্যে থাকাতে অনেকে আমীরকে ইহাতে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন।

২। মধ্যে জনরব উঠিয়াছিল কাবুলের আমীরকে কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে, এক্ষণে সে সংবাদ অলীক এবং দুষ্টলোকের রটনা বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে। আমীর মহোদয় সঙ্কটাপন্ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

৩। জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য দুইটী যুবক মজঃফরপুরে তাঁহার গাড়ীভ্রমে অপর একটী সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া দুইটী নিরপরাধা স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ করিয়াছে। যুবকদ্বয়ের একটী আত্মহত্যা করিয়াছে, অপরটী বিচারাধীন।

৪। কলিকাতায় কয়েকটী যুবক কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রাণনাশের জন্য একটী বোমার কারখানা খুলিয়া বোমা প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে এবং অম্লানমুখে অকুতোভয়ে নিজ নিজ দুষ্কার্য্য স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের সাহস ও দৃঢ়তা আশ্চর্য্য! এই দৃঢ়তা ও সাহস সৎপথে নিয়োজিত হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।

৫। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সার ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান্ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। স্বয়ং রাজা, প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী এবং বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সমাধিকার্য্যে উপস্থিত ছিলেন।

৬। কুমারী আরেণ্ডেল ও এনিবেসাণ্ট প্রমুখ কতকগুলি রমণীর উদ্যোগে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় নামে হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কাশীধামে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তত্রত্য কমিশনার-পত্নী শ্রীমতী লভেট বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। তত্রত্য কলেক্টর-পত্নী শ্রীমতী র‍্যাভিচি, শ্রীমতী আনিবেশান্ত ও অনেকগুলি শিক্ষিত ইংরাজ মহিলা এবং কাশীধামস্থ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বঙ্গমহিলা এবং হিন্দুস্থানী ও কাশ্মীরি রমণীগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কুমারী আরেণ্ডেল স্বয়ং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন ও মধ্যে মধ্যে বিলাত হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় বালিকারাই অবৈতনিক ভাবে শিক্ষালাভ করে। তাহাদের পুস্তকাদি শিল্পোকরণ, চিত্রোকরণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়; অপরন্তু প্রত্যেক বালিকা বৎসরে যত শিল্প প্রস্তুত করে ও চিত্রাঙ্কন করে তৎসমুদায়ও পারি-

তোবিকের সঙ্গে প্রদত্ত হয়। বারাণসী-ধামে হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য এই ইংরাজ রমণীর অকাতর পরিশ্রম, অশেষ যত্ন ও বহুল অর্থব্যয় অতীব প্রশংসনীয়। কুমারী আরেণ্ডল, কুমারী পামর ও আরও কয়েকটী ইংরাজ মহিলার অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টার ফলে বালিকারা শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন।

যোগ্যতানুসারে প্রায় শতাধিক বালিকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। কুমারী আরেণ্ডেলের ইচ্ছা তিনি তত্রত্য হিন্দুবিধবাদিগের নিমিত্ত একটী ট্রেণীংস্কুল সংস্থাপন করেন। ভগবান্ তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

---

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

মনোজবা। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী প্রণীত। ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

আমি এই কবিতা পুস্তকখানি অতি সাবধানে পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি যেমন সরল ও সুন্দর তেমনই মধুর ও সুখপাঠ্য। ইদানীং অধিকাংশ লেখক-লেখিকা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের ভাষা ও ভাব অম্লানচিত্তে আপন আপন পুস্তকে সন্নিবেশ করেন, কেহবা অনুকরণ করিয়া থাকেন। মনোজবায় সে দোষ নাই। মনোজবা স্বভাবকাননের সুন্দর পুষ্প, ভক্তিচন্দনে লিপ্ত এবং ভক্তিভাজন ৺ পিতৃদেব চরণে অর্পিত। এই পুস্তকে ৮৮ টী কবিতা, তন্মধ্যে নয়টী পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি প্রতিষ্ঠায়, দুইটী মাতৃ এবং পাঁচটী ভ্রাতৃস্নেহের মধুরতায় রচিত। দেবী ভারতীর নিকট প্রার্থনায় তিনটী, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের প্রতি দুইটী এবং শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে একটী লিখিত হইয়াছে। এই সমস্তগুলি পাঠ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব হয়। আবার 'শিখাও আমারে,' 'নিদর্শন,' 'কেন কাঁদি,' 'অন্বেষণ,' 'বিশ্বেশ্বর,' 'কৃষকবালা,' 'ভুলিতে কি পারি,' 'মরণ,' 'একাদশী,' 'আকুলতা,' 'শিশুর হাসি,' 'অবোধ ছেলে,' 'মধুময়,' 'একটী শিশুর প্রতি,' 'রমার চন্দ্রপূজা,' 'জাগ্রত স্বপন,' 'বিবাহ,' 'অতৃপ্তি,' 'পুণ্য,' 'প্রসাদ,' 'বিষাদের ছায়া,' 'নববর্ষের গতস্মৃতি,' 'নদীতীরে বিধবা,' 'মালতী কুটি,' 'বাসরে সমাধি,' 'একটী শিশুর প্রতি,' 'বিজয়াসম্ভাষণ,' 'প্রতিদান,' 'কেহ নহে একা,' 'হস্তাক্ষর,' এই কয়েকটী কবিতা উচ্চশ্রেণীর কবির যোগ্য। যেখানে যেটী ভাল লাগিয়াছে, সে সমস্ত উদ্ধৃত হওয়া সহজ নহে সম্ভবও নহে।

গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সদ্ভাবপূর্ণ। বালক-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইহা পড়িতে পারিবে এবং পড়িয়া প্রীতিলাভ করিবে। মনোজবায় দোষের মাত্রা অল্প, গুণের ভাগ অনেক অধিক।

এইরূপ ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াও লেখিকা, কৃষকবালা, রমার চন্দ্রপূজা,

বাসরে সমাধি প্রভৃতি কবিতায় যেরূপ কল্পনা এবং চরিত্র অঙ্কন নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, কালে তিনি কাব্যরচনায় সমর্থ হইবেন। ভরসা করি পাঠকগণ গ্রন্থখানি আদর ও স্নেহের-চক্ষে দেখিবেন। গ্রন্থকর্ত্রী মনোজবা প্রণয়ণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি নিরাময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মা।

---

# বামারচনা।

## নববর্ষ।

১

আবার আসিল ফিরে নূতন বরষ,—
লতা পাতা বৃক্ষ হেরি সকলি সরস ;
রঙ্গে স্রোতস্বিনী ধায় নরে বিভু গুণ গায়
নবীন প্রকৃতি পরে নূতন হরষ।

২

নব শশী উদিত গো নব নীলাকাশে,
নব তারা চন্দ্রে বেড়ে নব ভাবে হাসে ;
নব বর্ষ স্পর্শ পেয়ে প্রকৃতি এসেছে ধেয়ে,
প্রস্ফুট কমল নব সরোবরে ভাসে।

৩

নব শাখে বসি পাখী নব ভাবে গায়,
নবীন কুসুমরাজি পরাণ মাতায়,
নব স্রোতস্বিনী আজি নবীন সাজেতে সাজি
নবীন আশায় আলো নরমুখে ভায়।

৪

নবীন আকাশ আজি নব সূর্য্য নব শশী,
নবীন তারকাদল ছড়াইছে সুধারাশি,
নবীন কুসুমচয় নবীন মলয় বয়,
নবীন সৌরভ আজি ছড়ায় মলয় হাসি।

৫

স্বর্গের সুরভি লয়ে নবীন পবন
নব ভাবে করে আজি স্নেহ সঞ্চারণ!
নব ভাবে তরুপরে বিহগ কাকলী ধরে
নব স্রোতে ছুটে হৃদে প্রীতি-প্রস্রবণ!

৬

গগন পরেছে আজি নূতন তারার মালা,
সাজায়েছে দিগঙ্গনা নব ভাবে নব ডালা।
বসুমতী নববেশে নবীন সুহাসি হেসে
নববর্ষে বরিতে গো সাজায় নূতন থালা!

৭

সকলি নূতন আজি নূতন আপনি ধরা,
নবীন সাজেতে সাজি প্রকৃতি যে
মনোহরা ;—

৮

নবীন মানব প্রাণ—পুরাতন আজি ম্লান
শুধু মোর হৃদি কেন পুরাণেতে আছে ভরা!
দয়াময়! এ মিনতি—শান্তি বারি সেচি নব
নবীন করহ প্রাণ দাও প্রেম দাও জ্ঞান ;—
জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে ভরি একতার হার পরি
হাসুক ভারত পুনঃ হে বিভো! গৌরব তব।

শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী।

## নববর্ষে প্রার্থনা।

অন্তরের শোক দুঃখ,অন্তরে ফেলিয়া রাখি,
আজি এই নব বর্ষে তব পাশে ভিক্ষা চাই।
সাধিয়া তোমার কর্ম্ম যেন তবপাশে যাই।
সংসারের শোকে তাপে যেন গো না ট'লে
চিত।
হেরি এই বিভীষিকা প্রভু গো! না হই
ভীত।
এ জগৎ মোর'পর করুক্ যা অত্যাচার,
তাহাতে যাতনা যেন কভু নাহি পাই আর।
তোমার প্রেমেতে যেন সদাই মগন থাকি।
ক্ষুদ্র এই হিয়াখানি তোমার করুনা পেয়ে,
যেন নাথ! ক্রমে ক্রমে মিশায় অনন্তে যেয়ে
হৃদয়ের মাঝে মোর ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী মত,
বাসনার ঢেউ যাহা উঠিতেছে অবিরত,
তোমার অমৃত নামে যেন সব হয় লয়।
কৃপা করি এ বাসনা পূর মোর দয়াময়!

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

## বর্ষ-সঙ্গীত।

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
জাগিতেছে অতীতের কথা,
পুরাতন স্মৃতি মনোহর
অতীতের সকরুণ গাথা।
একে একে পড়েছে ঝরিয়া
সুখের সুন্দর ফুল গুলি,
একে একে শুখায়েছে কত
আশার সুন্দরতর কলি।
আহা!
সুখ যায় স্মৃতি কেন রহে
দুঃখ দিতে দুর্ব্বল মানবে,
আশা কলি ফুটিবেনা যদি
মনোহর হয় কেন তবে?
নব বর্ষ আর নব নও
তুমি মম এবে পুরাতন,
বারে বারে এক(ই) অভিনয়
কে তোমারে শিখাল এমন?

শ্রীমতী প্রিয়[illegible]।

---



৬৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 538. June, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৩৮ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। জুন, ১৯০৮। | ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

উপাধি লাভ—ভারত-সচিব জন্ মর্লি, ভাইকাউণ্ট মর্লি অব ব্লাকবরণ উপাধি গ্রহণ করিয়া লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

ক্ষমা—পোর্টুগালের রাজাকে হত্যা করার অপরাধে অনেকগুলি লোক ধৃত হইয়াছিল। নূতন রাজা হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ারস্ কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফো গত ১০ই মে দার্জ্জিলিংএ মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

অল্ ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিঃ আমীর আলির সভাপতিত্বে বিলাতে উক্ত ভারতীয় মুসলমান সমিতির একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন ইহার অভিপ্রায় না হইয়া সম্মিলিত ভারতের উন্নতিসাধনই এই সভার উদ্দেশ্য।

পুনার মাদকনিবারিণী সভা—পুনার মাদকনিবারিণী সভার উদ্যোগে তত্রত্য কতিপয় যুবক মাদক সেবন নিবারণের জন্য মদের দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার চেষ্টার অপরাধে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দণ্ডিত হয়। এ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকারের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের পক্ষ হইতে লাটসাহেবের নিকট ডিপুটেশন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ এ পরীক্ষায় এ বৎসর ১০৫৮ জন ছাত্র পাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭১ ও তৃতীয় বিভাগে ৪৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি গুণানুসারে বি, এ, এফ, এ ও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

পাস কোর্স।

রমা ভট্টাচার্য্য বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় " "
প্রতিভা গুহ " "
বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় " "
বনলতা দে প্রাইভেট।
সুষমা মৈত্র "
নীরোদবাসিনী সোম "

এফ, এ পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

সত্যপ্রিয়া ঘোষ—বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত— " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

শিশির কুমারী গুহ—বেথুন কলেজ।
মার্গারেট লাবণ্যলতা লভ—প্রাইভেট।
বাসন্তী মামগাইন—বেথুন কলেজ।
বিভা রায়— " "
শৈলবালা সরকার— " "
মৃণালিনী সরকার— " "

তৃতীয় বিভাগ।

কিরণ কুমারী বসু—বেথুন কলেজ।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল।

১ম বিভাগ।

নির্ম্মলা রায় বেথুন কলেজ।
সুশীলা সেন এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।

২য় বিভাগ।

স্নেহনলিনী বসু বেথুন কলেজ।
অমলা দাস " "
সুবর্ণপ্রভা দত্ত " "
প্রীতিবালা ঘোষাল " "
লীলালতিকা মুখার্জি " "
ললিতা রায় " "
শৈলজা চৌধুরী এডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।
কনসিডিনী এনাই লোরেটো হাউস।
সেওদাত অহজিন " "
বিদ্যুৎপ্রভা দত্ত নর্ম্মাল স্কুল।
মাধুরী বালা ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।
সোফিয়া হোরাজি সোম " "
স্নেহলতা মল্লিক এ, গার্লস এচ্ ময়মনসিংহ।

তৃতীয় বিভাগ।

ললিতা বসু প্রাইভেট।
ইন্দুপ্রভা ভট্টাচার্য্য ডায়োশিশন মিসন।
সুশীলাবালা বাগচী " "
সুরমা বিশ্বাস " "
সুষমা বিশ্বাস " "
সরোজিনী দত্ত শিক্ষয়িত্রী কাল্ এচ্।
কমলা দে চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল।
শৈলজা দে শিলচর গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ বাঁকিপুর ফিমেল স্কুল।
প্রেমপ্রভা নিয়োগী বেথুন কলেজ।
চেম্বার্স সিরিল লোরেটো হাউস।
সরসীবালা চাটুর্জী নর্ম্মাল স্কুল।

# ভক্তকবি তুলসীদাস।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )।

সকলি সাধনাসাপেক্ষ। জগদীশ্বর মনুষ্য-মধ্যে এমন সকল উপাদান দান করিয়াছেন যে, সাধনাদ্বারা সে সকল অদ্ভুত উৎকর্ষ ও অদ্ভুত শক্তি লাভ করে (১)। তুলসীর কঠোর সাধনার বিষয় ভাবিলে চমকিত হইতে হয়। তিনি অশ্রান্ত অভ্যাসবলে বাত-বর্ষ, শীতাতপ, আহার-নিদ্রা, শ্রান্তি, অবসাদ, সুখ-দুঃখ সকলি জয় করিয়াছিলেন। দুরারোহ হিমগিরি হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার গতি অপ্রতিহত ছিল। নানা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য, তিনি পদব্রজে সুদুর্গম স্থান সকলে অনায়াসে গমন করিতেন। গন্তব্য স্থান যত দূরে থাকুক, তথায় না পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেন না। চিত্রকূট, কাশীধাম ও অযোধ্যা এই তিনটী স্থান তাঁহার প্রিয়তম সাধনাক্ষেত্র। চিত্রকূটে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তুলসীদাসের তিরোধানের পর হইতে ঐ চিত্রকূট রামভক্ত যোগী, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। সীতা-রাম-হনুমান্-মূর্ত্তির সঙ্গে অসংখ্য তুলসীমূর্ত্তি চিত্রকূটের গাত্রে গাত্রে, গুহায় গুহায় বিরাজমান। তথায় তুলসীর নামে স্থাপিত অসংখ্য মঠ বিদ্যমান। প্রত্যহ বহুতর সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রেরা ঐ সকল মঠে আহার ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে।

তুলসীদাস পরোপকারের সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। তাঁহার প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কি উচ্চ, কি নীচ, রাজা, প্রজা, সকলেই নতশীর্ষে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। তিনি স্বয়ং নিঃস্পৃহ হইলেও, লোকের বিপদমোচন বা অন্যবিধ সৎকর্ম্মের জন্য সময়ে সময়ে ধনিগণকে অনুরোধ করিতেন। কাশীধামে টোডরমল নামে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। বড় বড় চারিখানি গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সদাশয় ও পরোপকারী। কোনও দুরাত্মা খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণসংহার করে। তুলসী এই সংবাদ পাইয়া কহিলেন ;—

"চার গাংবকো ঠাকুরো, মনকো মহা-
মহীপ।
তুলসী যা কলিকালমেং, অথয়ে টোডর-
দীপ ॥"

অর্থাৎ—টোডর, চারি গ্রামের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনোরাজ্যের

(১) কাশীর সুবিখ্যাত যোগী তৈলঙ্গস্বামীকে অনেকে দেখিয়াছেন, এবং অনেকে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার কয়েকটী অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল, তিনি তিরোধান করিয়াছেন। কাশীতে বাঙ্গালা ভাষায় ও হিন্দিভাষায় তাঁহার জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকেরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

মহিমান্বিত রাজা ছিলেন। আজি এই তামসযুগে টোডররূপ দীপটী নির্ব্বাণ হইল।

টোডরের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্র কাঁধাইরাম ও আনন্দরাম পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তুলসীর আজ্ঞামাত্র তাঁহারা ভ্রাতৃবিরোধ ছাড়িয়া পরম প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে কাশী-অঞ্চলে খানখানা নামে এক মহাপ্রভাব ব্যক্তি ছিলেন। খানখানা ধনশালী মুসলমান। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি মহাকবি। এক দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তুলসীর শরণাপন্ন হইল। তুলসী নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া সেই দরিদ্রকে দিয়া খানখানার নিকট প্রেরণ করিলেন, শ্লোকার্দ্ধ যথা ;—

"সুরতিয় নরতিয় নাগতিয়, সব চাহত
অসহোয়।

—অর্থাৎ সুরলোকের, নরলোকের ও নাগলোকের সকল নারীই পতিসহবাস কামনা করে।

খানখানা ঐ শ্লোকার্দ্ধ পড়িয়া সেই দরিদ্রের কন্যাবিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন এবং তুলসীর সেই শ্লোকার্দ্ধ এইরূপে পূরণ করিয়া তুলসীর নিকট পাঠাইলেন ;—

"গর্ভ লিয়ে হুলসী ফিরে, সোংসুত হোয় ॥"

অর্থাৎ—"তাহারা মহোল্লাসে এই জন্য পতি কামনা করে যে,—আমাদের গর্ভে যেন তুলসীর ন্যায় সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে।"

কথা সত্য ; "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি"—একটী কুলচন্দ্র সুসন্তান দ্বারা সমস্ত মানব-সমাজ আলোকিত হয়।

একদা কোনও পণ্ডিত, নায়কনায়িকা-ঘটিত অশ্লীলরসের একখানি কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া তুলসীকে উপহার দিয়া কহিলেন ;—গোঁসাইজি! আপনি পণ্ডিত হইয়া অগ্রাহ্য প্রাকৃতভাষায় (দেশী হিন্দিভাষায়) গ্রন্থ লেখেন কেন? তুলসী তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ এই দোহা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন ;—

"মণিভাজন বিষ পারঈ, পূরণ অমী নিহারী।
কা ছাংড়িয়, কা সংগ্রহিয়, কহহু বিবেক
বিচারি ॥
কা ভাষা কা সংস্কৃত প্রেম চাহিয়ে সাংচ।
কাম জো আবৈ কামরী, কা লে করৈ
কমাচ ॥"

অর্থাৎ—বিষপূর্ণ মণিময় পাত্র এবং অমৃতপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য এবং কোন্‌টী অগ্রাহ্য, তাহা বিবেকশক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখা উচিত। দেশীভাষাই কি, আর সংস্কৃত-ভাষাই কি, বিশুদ্ধ প্রেমপদার্থ চাই। যদি কম্বলে শীত নিবারণ হয়, তবে সোণার জামায় কি প্রয়োজন? (১)।

(১) তুলসীর রামায়ণাদি কাব্য, দোঁহাবলী ও অন্যান্য প্রবন্ধসকল যদি হিন্দিভাষায় রচিত না হইয়া সংস্কৃতভাষায় রচিত হইত, তবে ভারতের অধিকাংশ লোকই ঐ সকলের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিত। দেশীভাষায় রচিত বলিয়াই সর্ব্ব-সাধারণে উহার পাঠে ও অর্থগ্রহণে সমর্থ। গৃহে, হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, দোকানে, ইতর, ভদ্র

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—অযোধ্যা, কাশী ও চিত্রকূট তুলসীর প্রিয়তম স্থান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পান্থশালা, অতিথিশালা, মঠমন্দিরাদি নানাস্থানে বিকীর্ণ হইলেও, ঐ তিন স্থান তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্থান। যাত্রীরা কাশীধামে গিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটী স্থান পরম তীর্থজ্ঞানে দর্শন করিয়া থাকে। ১ম,—অসীর নিকট 'তুলসী ঘাট', তথায় মন্দিরমধ্যে তুলসীর স্থাপিত হনুমান্-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরের বহির্গাত্রে একটী মন্ত্র খোদিত আছে, উহা 'বীসাযন্ত্র' নামে খ্যাত। কথিত আছে, তুলসীদাস স্বহস্তে ঐ মন্ত্র খোদিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, ঐ বীসাযন্ত্রের মন্ত্রাক্ষরগুলি ভূর্জ্জাদি পত্রে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া, তাহা কবচ বা মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে শিশুগণের অসাধ্য রোগের শান্তি হয়। ঐ মন্দিরের পার্শ্বেই তুলসী-গুফা। তুলসী অন্তিমকালে ঐ গুফায় ছিলেন। ২য়,—শ্রীমুকুন্দরায়ের বাগিচার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, গোপালমন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ; উহা তুলসীর বৈটকখানা ছিল। ঐ গৃহ সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, কেবল প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে ঐ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সকলে জানালার ফাঁক দিয়া ঐ গৃহের অভ্যন্তর দেখিয়া থাকে। কথিত আছে,—তিনি ঐ গৃহে বসিয়া "বিনয়-পত্রিকা" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ৩য়,—'প্রহ্লাদঘাট'। ৪র্থ,—'সঙ্কটমোচন' নামক বিখ্যাত হনুমান্-মূর্ত্তি; ইহা অসীনালার উপর স্থাপিত। লোকে সঙ্কটে পড়িয়া ঐ মূর্ত্তির পূজা করে এবং ঐ স্থানে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। কথিত আছে,—গঙ্গারামজী নামে এক জ্যোতিষী একদা কাশীরাজের নিকট বহু অর্থ পাইয়া তুলসীর চরণে অর্পণ করেন। তুলসীর আজ্ঞায় তিনি সেই অর্থে অসীর উপর বারটী হনুমান্-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন; তন্মধ্যে এক্ষণে একটী মাত্র বিদ্যমান। অসীর ঘাটে মহাসমারোহে তুলসীর রাম-লীলা মহোৎসব হইত। উক্ত রামলীলার "লঙ্কা" নামক স্থানটী অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ঐস্থানে কৃষ্ণলীলা মহোৎসবও করিতেন, উহাও অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

অসীঘাট তুলসীর প্রিয় বাসস্থান ছিল। ঐ স্থান অতি রমণীয়, জনতাশূন্য ও পরিষ্কৃত। ঐ স্থানে কাশীনরেশের উদ্যান, বৈটকখানা বাটী ও ভূগর্ভে বিশাল হোম-শালা নির্ম্মিত আছে। ঐ স্থানের গঙ্গা-জল স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্ম্মল ও মধুর।

অনেকেই দৈনিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যার পর সমবেত হইয়া, তুলসীর গ্রন্থসকল ভক্তিভাবে পাঠ ও শ্রবণ করে। ইহা দ্বারা তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে, সাংসারিক কর্ত্তব্যবিষয়েও তাহারা অশেষ জ্ঞানলাভ করে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়নে ও মর্ম্মগ্রহণে কয় জন সমর্থ? তুলসী সংস্কৃতভাষায় যে কয়েকটী স্তোত্র ও মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, তিনি বিশুদ্ধ ও সুললিত সংস্কৃত পদাবলীর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কেবল সর্ব্বসাধারণের হিতার্থেই দেশীভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জ্ঞান হয় যেন তুলসী-হৃদয়ের শান্তি ও পবিত্রতা ঐ স্থানে জীবন্তভাবে বিদ্যমান। কাশীর একপ্রান্ত বরুনানদী, অপর প্রান্ত অসীনদী। ঐ দুই নদীর নামে কাশীর নাম 'বারাণসী' হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুই নদী শুষ্কপ্রায়। একদা তুলসীদাস অযোধ্যাপুরী ধ্যান করিতে করিতে অসীঘাটে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ডুবিয়া জলমধ্য দিয়াই তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে উঠিলেন, উহা গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থান। তিনি উঠিয়া তত্রত্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কোন্ ঘাট? এ স্থানের ও এ স্থানের রাজার নাম কি? লোকেরা কহিল,—ইহা অযোধ্যার রামঘাট, এস্থানের রাজার নাম রামসিংহ এবং এ নগরের নাম রামপুর। বারংবার রামনাম শ্রবণ করিয়া তুলসীর প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। লোকেরা কহিল,—এ স্থানে আসিলে রাজাকে কর দিতে হয়। তুলসী কাতরভাবে কহিলেন,—আমি দরিদ্র, অর্থ কোথা পাইব?

এদিকে তুলসীর আগমনবার্ত্তা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাজা রামসিংহ তুলসীপ্রভুর শুভাগমন শ্রবণে পুলকিত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে আসিয়া তদীয় চরণে পতিত হইলেন। রাজা করযোড়ে কহিলেন,—প্রভো! যদি কৃপা করিয়া এ দাসকে পদধুলি দিলেন, তবে এ শরণাগতকে আপনার শিষ্য করুন। আপনার শুভাগমন উপলক্ষ্যে আজি নগরের সমস্ত দীন-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অন্নবস্ত্র দান করা হউক। অনন্তর তুলসীর সম্মতিক্রমে রাজা তাঁহার নিকট যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, নগরে মহোৎসব হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দেশের সমস্ত অধিবাসী রামভক্ত হইল। রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গুরুদেবের চরণপাদুকা (খড়ম) স্থাপন করিলেন। তিনি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ঐ গুরুপাদুকা পূজা করিয়াছিলেন।

হরিপ্রাণা মীরাবাই (১) সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ

(১) মীরাবাই মর্ত্তানামক দেশের রাজকন্যা, উদয়পুরের মহারাণার পত্নী। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অহেতুকী ভক্তি ছিল। তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত। কৃষ্ণভক্তা মীরার উপর তদীয় স্বামী ও শ্বশ্রূ ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অম্লান মুখে সকলি সহ্য করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সাধনা হইতে বিচলিতা হইলেন না। শ্বশ্রূ মীরার সংহারের জন্য তদীয় চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিলেন। কথিত আছে, স্বীয় চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিবার জন্য মীরা গতিদত্ত বিষপানেও মরেন নাই। মহারাণা কুপিত হইয়া মীরাকে খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল, মীরা অক্ষতদেহে রহিলেন। শেষে মহারাণা মীরাকে ধর্ম্মসাধনাবিষয়ে স্বাধীনতা দান করায়, মীরা নানা তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উচ্ছলিত প্রেমপূর্ণ ভগবৎসঙ্গীতে পশুপক্ষীরাও মুগ্ধ হইত। কথিত আছে,—আকবর বাদসাহ নিজ সঙ্গীতাচার্য্য তানসানের সহিত বৃন্দাবনে গিয়া মীরার সঙ্গীতশ্রবণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। উদয়পুরে ও অন্যান্য স্থানে মীরার প্রতিষ্ঠিত মঠমন্দিরাদি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এইরূপ প্রবাদ যে, মীরা স্বীয়

করিয়া, হরিভজনেই নিযুক্তা থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মীরা অতিমাত্র নিগৃহীতা হইয়া, তুলসীদাসকে পত্র লিখিয়া মর্ম্মবেদনা জানাইলেন। লিখিলেন যে,—আমার স্বামী প্রভৃতি পরমাত্মীয়েরাই আমার সাধনাপথে গুরুতর বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। এখন আমি কি করি? তুলসীদাস তদুত্তরে মীরাকে নিম্নলিখিত ভজনগাথা লিখিয়া পাঠান ;—

"জিনকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তিহেঁং কোটি বৈরীসম যদ্যপি
পরমসনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ ভরত বংধু
মহতারী।
গুরু বলি তজ্যো কংত ব্রজবনিতন ভয়ে
সব মংগলকারী॥
নাতো নেহ রামকো মানিয়া সুহৃদ
সুসেব্য জহাংলোং।
অংজন কৌন আংখ জো ফুটৈ বহতৈ—
কহোং কহাং লোং॥
তুলসি সোই সব ভাংতি আপনো পূজ্য
প্রাণতে প্যারো।
জাতে হোয় সনেহ রামসোং সোঈ মত
হমারো॥"

এই ভজনগাথার অর্থ এই যে,—"যাঁহাদের ভগবানে প্রীতি নাই, তাঁহারা তোমার পরম স্নেহবান্ আত্মীয় হইলেও, কোটি-শত্রু-সম পরিত্যাজ্য। দেখ!—প্রহ্লাদ হরিভক্তিবিমুখ পিতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিভীষণ রামবৈরী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভরত রামদ্বেষিণী জননীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিরাজ হরিবিরোধী গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন (১)। কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকারা পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানেই প্রেম নিবদ্ধ করা চাই। যাহাতে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই অঞ্জনই সেবনীয় ; যদ্দ্বারা জ্ঞান-নেত্র বিনষ্ট হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। সার কথা এই যে,—যাঁহার উপদেশে ঈশ্বরে পরানুরক্তি জন্মে, তিনিই আমার পূজ্য ও প্রাণাধিক প্রিয়তম!"

তুলসীর এই কথাগুলি ভগবৎসাধনার পক্ষে সার সত্য। 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' না হইলে, অর্থাৎ মনকে সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভগবানে সংলগ্ন

ভৌতিক দেহের তিরোধান সম্বন্ধে স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সমীপে পাষাণভেদী কাতরস্বরে প্রার্থনা করায়, ঐ মূর্ত্তি মুখব্যাদন করিলেন, এবং মীরা লম্ফ দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার স্মরণার্থে উদয়পুরে মীরার ও তদীয় ইষ্ট দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং অদ্যাপি ঐ দুই মূর্ত্তির পূজা যথাবিধি হইয়া থাকে। তুলসীর ন্যায় মীরারও রচিত হিন্দি ভজনগাথা সকল প্রসিদ্ধ। মীরা তুলসীদাসকে ইষ্টগুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

(১) বলিরাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বামনরূপী হরিকে অঙ্গীকৃত ত্রিপাদভূমিদানে নিষেধ করেন ও বাধা উৎপাদন করেন, কিন্তু বলিরাজ গুরুর সে নিষেধ মানেন নাই।

করিতে না পারিলে, ভগবৎসাধনা হয় না, সে ব্রহ্মানন্দ-ভোগে অধিকার জন্মে না।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ! ॥"

"তুমিই মাতা, তুমিই পিতা ; ভাই, বন্ধু আত্মীয় স্বজন তুমিই ; আমার বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়-বিভব সকলি তুমি। হে দেবদেব ! তুমি আমার সকলি।"

এইরূপে সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের এক-টানা স্রোত সেই প্রেমসাগরের দিকে প্রবর্ত্তিত হইলে, তবে ভগবৎসাধনা হয়। সর্ব্বত্যাগিনী গোপবালারা এইরূপ সাধনা করিয়াছিল। তাহাদের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, সকলি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। শুকদেব-সদৃশ মদীয় ৺ পিতৃদেবের একটী গান এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

(উদ্ধবের প্রতি গোপিকাদের উক্তি।)

("মোরা) কৃষ্ণসুখে সুখী ব্রজাঙ্গনা।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ না করি সাধনা।
শুন ওরে উদ্ধব ! আমরা গোপিকা সব
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রস করিহে কামনা !"

হে উদ্ধব ! তিনি আমাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি অন্তঃসাক্ষী, সকলি জানেন, তথাপি তাঁহাকে বলিও,—তাঁহার এ দাসীরা তাঁহার সুখেই সুখী। তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া আমাদের হাতে হাতে চতুর্ব্বর্গ দান করিলেও, আমরা তাহা লই না। আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহারি প্রীতি। আমরা সেই মধুক্রমের মাধুর্য্য-রসেরই ভিখারিণী। আমাদের পাপের ফল ও পুণ্যের ফল—তাঁহার বিরহ ও সম্মিলন।

কয়েকটী গোপবালার এইরূপে মোক্ষ-লাভ হইয়াছিল ;—

"তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপ-
কন্যকা ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

ভোগেই কর্ম্মফলের ক্ষয় হয়। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"—বিনা ভোগে শতকোটি কল্পেও কর্ম্মফলের ক্ষয় হয় না। পাপ পুণ্য নির্ম্মূল না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। ফলের একটু বীজ অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা আবার অঙ্কুরিত এবং ক্রমে পল্লবিত ও ফলিত হয়। এজন্য বীজের ধ্বংস করা চাই। কয়েকটী গোপিকার কৃষ্ণবিরহ-সন্তাপ এত সুতীব্র হইয়াছিল যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পাপফল দগ্ধ হইয়া গেল। আবার কৃষ্ণচিন্তাজনিত আনন্দ তাহাদের হৃদয়ে এত বিপুল, এত গভীর ও এত প্রগাঢ় যে, তাহাতেই তাহাদের সমস্ত পুণ্যফল নিঃশেষিত হইল। তাহারা কান্তভাবে ধ্যান করিলেও সেই পরম-ব্রহ্মকেই ধ্যান করিতেছিল। সেই অবস্থায় যখন তাহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গেল, তখনি তাহারা মুক্তিলাভ

করিল। সাধনা যত গভীর হয়, সিদ্ধিও তত সন্নিহিত হয়। হৃদয়ে সে প্রেম-হুতাশন প্রজ্বলিত হইলে, দাবানলে তৃণরাশির ন্যায় অশেষ বাসনারাশি ভস্মীভূত হয়। ভক্তবৎসল নারায়ণ স্বয়ং প্রহ্লাদের সমীপে আবির্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, প্রহ্লাদ বলিলেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
ধর্মার্থকামৈঃ কিংতস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)।

—সন্নিপাত-বিকারের তৃষ্ণার মতন,
বিষয়ে যেরূপ তৃষ্ণা করে মূঢ়গণ,
সেইরূপ তৃষ্ণা মোর যেন দয়াময়!
হরি হে! তোমারি পদে চিরকাল রয়।
সহস্র সহস্র যোনি করিব ভ্রমণ,
হে নাথ! তাহাতে কষ্ট না করি গণন;
কিন্তু হরি! যে যোনিতে পড়িব যখন,
তোমাতে একান্তভাবে থাকে যেন মন।
অখিল বিশ্বের মূল তুমি ভগবান্,
তোমাতেই আত্মা যেই করে সমাধান;
হস্তেই তাহার মোক্ষ থাকে অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামে তার কিবা প্রয়োজন?

অহহ! প্রহ্লাদ! তুমিই ভগবান্‌কে ডাকিতে জান, এবং সেই প্রাণারামের নিকট কোন বস্তু চাহিতে হয়, তাহাও জান। আমরা সমুদ্রের বহিশ্চর, শঙ্করান্বেষী মৎস্যরঙ্ক (১)। রত্নাকরের গভীর গর্ভে কি রত্ন নিহিত আছে, কিরূপে জানিব? সাধনা চাই। যদি বল,—সে সাধনা কি সহজ কথা, সে যে অসাধ্য সাধন। সাধ্য কি অসাধ্য, তাহাই বা দেখিলাম কৈ? "পরিবার পরিবার" "অর্থ অর্থ" করিয়া যাহা করিলাম, তাহা যদি ঈশ্বরসাধনায় নিয়োজিত করিতাম, আজি শেষবয়সে এ দারুণ যাতনায় চিৎকার ছাড়িতে হইত না। কার্ডিন্যাল উল্‌জি, ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনিরির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একান্তভাবে অবিশ্রান্ত রাজসেবায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন। শেষে সেই রাজাই যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বৃদ্ধ উল্‌জি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"If I had served God as diligently as I have served the king, He would not have given me over in my grey hairs."—যেরূপ একান্তভাবে আমি রাজসেবা করিলাম, সেইরূপে যদি ঈশ্বরসেবা করিতাম, এ বৃদ্ধ দশায় ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিতেন না।

অবিবেকী মানবের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়াই দয়ার্দ্রহৃদয় মহাত্মারা অশেষ প্রকারে মানবের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণপ্রদ উপদেশে অনাস্থা করিয়াই আমরা যাতনা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। আমাদের

(১) 'মৎস্যরঙ্ক'—মাছরাঙ্গা পাখী। 'শঙ্করান্বেষী'—যে চুণাপুঁটি খুঁজিয়া বেড়ায়। মাছরাঙ্গা জলের উপর চুণাপুঁটি ধরিয়া বেড়ায়।

পরিণামকে ঘোর বিভীষিকাময় করিতেছি। একজন কবি বলিতেছেন ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং ;
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং ;
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতো শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥

—পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্বপ্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ,
প্রাণপণে যে না করে তাহার সাধন,
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ দুঃখানল দহে অনিবার।

একদা এক বৈশ্য তুলসীদাসকে কহিল ;—ঠাকুর! আমি রঘুনাথজীর দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভের উপায় করুন। তুলসী কহিলেন,—ভগবান্ রামচন্দ্রের দর্শনলাভ সহজ নহে, উহা কোটিজন্ম-সাধনার ফল। বৈশ্য কিছুতেই ছাড়িল না, বলিল,—দয়া করিয়া এখনি কোনও উপায় করুন। তুলসী তদীয় ভক্তি পরীক্ষার্থে কহিলেন,—তুমি এক কাজ কর, একটী বড়বা আনিয়া উহা উর্দ্ধমুখ করিয়া এস্থানে প্রোথিত কর, এবং তুমি এই বৃক্ষে উঠিয়া, বড়বার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের উপর বেগে ঝম্প দিয়া পড়। ইহাতে রামদর্শন হইলেও হইতে পারে। বৈশ্য ঐ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—ঠাকুর! বড়বার আগায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, আমি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইব, কাজ নাই আমার রামদর্শনে, ইহা বলিয়া বৈশ্য প্রস্থান করিল। অন্যান্য লোক-বৃন্দের সহিত এক ক্ষত্রিয় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে না। তিনি তুলসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নিজহস্তস্থিত বড়বা সেই স্থানে পুতিলেন এবং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, "জয় রাম" শব্দে সেই বড়বার অগ্রভাগে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। অহো! বিধাতার ইচ্ছা অচিন্তনীয়! কে যেন আসিয়া তাঁহাকে শূন্যে ধরিয়া রাখিল। বড়বার অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষ-স্পর্শ করিল না। তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন,—সম্মুখে এক অপরূপ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-মূর্ত্তি! দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে ও ভক্তিভরে বিহ্বল হইয়া তুলসীর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

মাদৃশ জড়বুদ্ধি লোকে মনে করিতে পারে,—ইহা ও কি সম্ভব? সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রে ঝম্প দিয়াও অক্ষত রহিল! কিন্তু এরূপ অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা শত শত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কাশীর তৈলঙ্গস্বামীকে একজন খাদ্যের সঙ্গে সুতীব্র বিষ ভোজন করাইয়াছিল, তিনি অম্লানমুখে বিষ

ভোজন করিয়া অবিকৃত রহিলেন। তাঁহার আত্মা তখন পরমাত্মার ধ্যানে তন্ময়, এজন্য তাঁহাতে বিষশক্তি ব্যর্থ হইল। ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রহ্লাদ-চরিত্রে বিবৃত আছে। যখন প্রহ্লাদের প্রাণ-সংহারের জন্য জল, অগ্নি, বিষ, বায়ু প্রভৃতি অশেষ প্রকার বধোপায় নিষ্ফল হইল, হিরণ্যকশিপু আর কোনও বধোপায় খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতম্ উতাহো সহজং তব॥"

—প্রহ্লাদ তোমার আশ্চর্য্য প্রভাব। তোমার এ সকল কি ব্যাপার? একি তোমার স্বাভাবিক শক্তি? অথবা মন্ত্রাদি-শক্তি?

প্রহ্লাদ পিতৃচরণে প্রণত হইয়া কহিলেন;—

"ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত! নবা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি।"

—হে পিতঃ! ইহা মন্ত্রাদিশক্তিও নহে, আমার স্বাভাবিক শক্তিও নহে। সেই অবিকারী নারায়ণ যাহার যাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহার তাহার এ শক্তি সামান্য ব্যাপার।

সেই ক্ষত্রিয়যুবা সাধুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছিলেন, ভক্তবৎসল তখনি আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।—"রাখেন হরি, মারে কে?"

(ক্রমশঃ)

---

# কাশ্মীর॥

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)॥

কাশ্মীরে যাইবার যে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে রাওলপিণ্ডি হইতে শকট যাইবার উপযোগী যে পথ বিতস্তার (ঝিলমনদী) তীর দিয়া গিয়াছে, সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুবিধাজনক। অন্যান্য পথ বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। খাদ্যদ্রব্য-ও থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। কোন-প্রকার শকটই চলে না, অত্যন্ত চড়াই ও উৎরাই। কেবল ডাণ্ডি বা ঘোটকে যাওয়া চলে। জম্বু হইতে শ্রীনগরের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সোজা ও কম; মধ্যে মধ্যে মহারাজের বিশ্রামাগার আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু মহারাজের অনুমতি ব্যতীত বিশ্রামাগার পথিকদিগের জন্য উন্মুক্ত হয় না—এবং তিনি বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে যান, বাহন, খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই মিলে না।

কিন্তু রাওলপিণ্ডি হইতে যে পথ গিয়াছে, তাহাতে সকল রকম যান বাহন চলে। চড়াই ও উৎরাই বেশী নাই। পথে

পান্থশালা, বিশ্রামাগার, ডাক বাঙ্গালা আছে। সর্ব্বদা লোকের যাতয়াতের জন্য কোনও বিপদের আশঙ্কাই নাই।

রাওলপিণ্ডি হইতে গাড়ি ঠিক্ করিতে হয়। ধনজিভাই নামক একজন পার্শি বণিক্ সরকারি ডাক লইয়া যাইবার জন্য কাশ্মীররাজা হইতে অনুমতি পাইয়াছে, সেইজন্য কাশ্মীররাজ্যের ভিতর গাড়ির ঘোড়া বদল করিবার আড্ডা ও ঘোড়া রাখিবার অধিকার আছে। শীঘ্র ঘোড়া বদল হয় বলিয়া তাহার গাড়িই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র পৌঁছে। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর ২০০ মাইল, এই পথ ধনজিভাইএর গাড়িতে আড়াই দিনে পৌঁছিয়া দেয়। টঙ্গা, ল্যাণ্ডো, ভিক্‌টোরিয়া, একা প্রভৃতি সকল রকম যানই পাওয়া যায়। টঙ্গার ভাড়া ১২০৲ টাকা করিয়া, ইহাতে চালক ব্যতীত তিনজন মাত্র আরোহী যাইতে পারে। দুই একটী ট্রংক, একটী ছোট বিছানা, টিফিন বাক্স সহজেই টঙ্গায় যাইতে পারে—ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে একা-করাই সুবিধা। একার ভাড়া ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকার মধ্যে। কাশ্মীরে পৌঁছিতে সাড়ে তিন দিন লাগে।

ধনজিভাইএর আড্ডা ব্যতীত আরও কয়েকটী গাড়ির আড্ডা রাওলপিণ্ডিতে আছে। ইহাদেরও সকল রকমের গাড়ি কাশ্মীরে যাতায়াত করে, ভাড়াও কম। কিন্তু কাশ্মীররাজ্যের ভিতর ইহাদের ঘোড়া বদল করিবার অনুমতি নাই। কাজেই একটী জুড়িতে সমস্ত পথ, থামিয়া থামিয়া লইয়া যায়, সেই জন্য তাহাদের গাড়ি শ্রীনগর পৌঁছিতে ৫ দিন লাগে। এই সকল গাড়িওয়ালাদিগের মধ্যে 'Eclipse Carrying Co.' সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও স্বত্বাধিকারী বাবু লাল্‌তা প্রসাদ অতি ভদ্রলোক।

যাহা হউক, আমরা ধনজিভাইএর আড্ডায় যাইয়া টঙ্গার বন্দোবস্ত করিলাম। স্থির হইল যে অতি প্রত্যূষে—এমনকি একটু রাত্রি থাকিতে আমরা রাওলপিণ্ডি হইতে যাত্রা করিব; তাহা হইলে মরি শৈলে পৌঁছিতে বেলা ১১টা হইবে। তথায় রাওলপিণ্ডির বন্ধুর একটী মিত্র কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করেন—তাঁহার বাটীতে স্নানাহার সমাপন করিয়া বেলা ২টা নাগাইদ পুনরায় রওনা হইব।

এখানে বলা আবশ্যক, রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিতে হইলে মরি-শৈল পার হইয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়টী উচ্চে নিতান্ত কম নহে—সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৭০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপর একটী ক্ষুদ্র সহর স্থাপিত হইয়াছে।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরি ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে রাওলপিণ্ডি ও তৎ-সন্নিকটস্থ শ্বেতাঙ্গেরা এই শৈলাবাসে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। বাঙ্গালার যেমন দার্জ্জিলিং, রাওলপিণ্ডি জেলার তেমনি মরি। মরিতে প্রথমতঃ ঐ দেশস্থ গোরা সৈন্যগণের জন্যই গবর্ণমেণ্ট সেনানিবাস প্রস্তুত করেন, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ আসিয়া আবাস

নির্ম্মাণ করাতে একটু সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে ধনজিভাইএর ঘোড়া বদ্‌লাইবার একটী আড্ডা আছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী সাধারণের বিশ্রামাগার আছে।

পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা রাত্রি ৪টার সময় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, অস্তগমনোন্মুখ সুধাংশুর ক্ষীণ রশ্মিজাল নিদ্রাকুলিত রাওলপিণ্ডির বক্ষে সুধাবর্ষণ করিতেছে। আমাদের টঙ্গা শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। ক্রমে পরিচিত লোকালয়, বাজার ছাড়াইয়া মরির রাস্তায় পড়িল। রাস্তার দুইধারে সারি সারি শিশুগাছ যেন প্রহরীর স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাওন নদী উত্তীর্ণ হইলাম, বরাকু ডাক বাঙ্গালা ছাড়াইয়া গেলাম, রাত্রি প্রভাত হইল, উষার অরুণালোকে দেখিলাম যে, টঙ্গা ক্রমে উচ্চে উঠিতেছে, দূরে গিরি-শৃঙ্গ সকল প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রতিভাত হইতেছে। এখন বেশ প্রভাত হইয়াছে—টঙ্গা এখন প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চে পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরি-শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল—ট্রেট ডাকবাঙ্গালা ছাড়াইলাম, —চড়াই ক্রমশঃ বেশী হইতে লাগিল—৩মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হইতে লাগিল, একটী ক্ষুদ্র অরণ্য অতিক্রম করিলাম, ৩২॥০ মাইলের নিকট মরির প্রসিদ্ধ ভাঁটিখানা দেখিলাম। তাহার পর "সনিবাঙ্ক" নামক হোটেল ছাড়াইয়া টঙ্গা মরি সহরের রাস্তায় প্রবেশ করিল। প্রায় তিন মাইল যাইবার পর ধনজিভাইএর আড্ডায় টঙ্গা পৌঁছিল। তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। আমরা সেখানে টঙ্গা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাটীর অনুসন্ধানে চলিলাম। চৌরাস্তায় বন্ধুর ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে—পরিচয়ের পর বন্ধুর বাটীতে গেলাম। অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে কি রকম করিয়া আমাদের আপ্যায়িত করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণেক বিশ্রামের পর স্নানাহার সম্পন্ন করা গেল। গৃহস্বামী ছাড়িবার পাত্র নহেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করা গেল। বেলা ২টার সময় বিদায় লইয়া টঙ্গা-আফিসে আসিলাম—আসিবার সময় মনটা বড় কাতর হইয়াছিল। সেই দুই ঘণ্টার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, সে আদর, সে যত্ন ভুলিব না—শিশুদিগের সে মিষ্ট অভ্যর্থনা চিরদিন মনে থাকিবে। আসিবার সময় যখন মনে হইল যে, ইহার পর আর বঙ্গবাসীর আশ্রয় মিলিবে না—আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের রীতিনীতির সহিত পরিচয়ের এই শেষ স্থান পার হইলাম, ইহার পর যে দেশ দিয়া যাইব, যে গ্রামে বা নগরে আশ্রয় লইব—সে স্থানের লোক হয়ত আমার আচারব্যবহারে হাসিবে, হয়ত আমার রীতি নীতি, ভাব-ভঙ্গী তাহারা বাতুলতা বলিয়া মনে করিবে। আজ পর্য্যন্ত

স্বদেশবাসীর আশ্রয়ে ছিলাম—রাত্রি প্রভাতে বিভিন্ন রাজ্যে বিদেশীর অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতে হইবে। যাহা হউক, বেলা প্রায় ২৷৹ টার সময় পুনরায় টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। টঙ্গা দ্রুত-বেগে মরি অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া নামিতে লাগিল। এখন হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল—কোহালা ডাক্‌বাঙ্গালা পর্য্যন্ত একেবারে ঢালু। রাস্তার একদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত, অপর দিকে ভীতিপ্রদ খাদ। মরি হইতে কোহালা সাড়ে সাতাস মাইল, ইহার মধ্যে কোন বিশ্রামভবন নাই। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার সময় ইহার অভাব বড়ই অনুভূত হয়। কোহালা ব্রিটিশরাজ্যের শেষ সীমা। একদিকে মরিশৈল, অপর দিকে কাশ্মীররাজ্যের ভূধরমালা—মধ্যে মধ্যে বিতস্তার সলিলপ্রবাহ শ্বেত রেখার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নদীর অপর তীরের শৈলশ্রেণীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যস্থ কৃষকদিগের কুটীর হইতে একটী একটী করিয়া দীপ সন্ধ্যাতারার ন্যায় ফুটিতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ যে বিতস্তা, শীর্ণতোয়া এবং অস্পষ্ট রেখাবৎ দেখা যাইতেছিল, এখন তাহার কলনাদ শ্রুত হইতে লাগিল এবং উদীয়মান চন্দ্রালোকে তাহার সফেন বিপুল প্রবাহ হিমালয়ের যশোধারার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

( ক্রমশঃ )।

---

## পাগল মন।

১

হাসিছে প্রকৃতি,
হাসিছে জগত,
আমি কেন তবে
হাসিব না।
ভাসিছে জগত
সুখ-সরোবরে,
আমি কেন তবে
ভাসিব না॥

২

ছিল একদিন
আমার(ও) ধরায়,
হেসেছি কতই
পরাণ খুলে।
বিষাদ অশান্তি
যেত দূরে ভাসি,
পারেনিত কভু
ছুঁইতে ভুলে॥

৩

(আজ) কোথা সেই হাসি,
কোথা সেই খেলা,
কোথা সে আমার
শান্তি অমল।
অশান্তি-কালিমা

ভরা এ হৃদয়
বড় জ্বালাময়
তীব্র গরল ॥

৪

গাহিতেছে পাখী
খুলিয়া পরাণ
আপন আনন্দে
আপনা হারা।
আমিও গেয়েছি
ওই পাখী মত
ঢালিয়া কতই
সুধার ধারা ॥

৫

খেলিতেছে শিশু
নির্ম্মল আনন্দে
জগত সংসার
সকলি ভুলে।
আমিও খেলেছি
ওই শিশু মত
সরল পরাণে
হৃদয় খুলে ॥

৬

কত নর নারী
কত সাধ আশা
নিমেষে নিমেষে
উথলে বুকে।
আমিও অমনি
কত সুখ-ছবি
কল্পনার সাথে
এঁকেছি সুখে ॥

৭

সুখ বাল্যকাল,
মধুর কৈশোর,
সুখের যৌবনে
কতনা ছবি !
(আজ) হতাশ নিরাশ,
হারায়ে সকল,
দুখের এ গানে
হয়েছি কবি ॥

৮

উৎসবের বাঁশী,
মধুর রাগিণী,
আর ত বাজে না
আমার পুরে।
শরৎ বসন্ত,
মলয় পবন,
আমারে ফেলিয়া
গিয়াছে দূরে ॥

৯

কুহেলিকা মাখা
জীবন আমার
একটু হেথায়
না আসে আলো।
হাসেনা চাঁদিমা,
হাসে না তপন,
চিরদিন সম
আঁধার কালো ॥

১০

আঁধারে রয়েছি
আঁধারে চলেছি
আঁধারেই ফিরি
হারাই পথ।

সঙ্গী সাথী নাই
একেলা একেলা
এমন করিয়া
রহিব কত ॥

১১

(তাই) হাসিরাশি হেরি,
হাসিবারে যাই,
আগেই নয়নে
আসেরে ধারা।

হাসিছে জগত,
প্রাণিবৃন্দ হাসে,
তুই কেন মন!
পাগল পারা ॥

---

# প্রণয়ে প্রমাদ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দশজনে বলে, কোনও দূরদেশে গিয়া তুমি নাকি আবার বিবাহ করিয়া আসিয়াছ। এই বলিয়া ছুবুটী ঠাকুরাণী কথা আরম্ভ করিলেন।

স্বামী কহিলেন হাঁ করিয়াছি।

স্ত্রী তখন আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়া কহিলেন,কি আবার বিবাহ করে এসেছ?

স্বামী—হাঁ বিয়ে করে এসেছি।

স্ত্রী—কেন?

স্বামী—তোমার সন্তান হয় নাই বলিয়া।

স্ত্রী—আর?

স্বামী—আর কিছু না।

স্ত্রী—আর প্রথম যৌবন গিয়েছে বলিয়া' অবা ঠাকুরাণী ত একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

স্বামী সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না। স্ত্রী আবার কহিলেন, কোথায়?

স্বামী—বহুদূর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি, এ অনুতাপে আমি মরিব। এই বলিয়া স্বামী কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশুদ্ধচরিত্রা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মুখে কাতর বাণী শুনিয়া উপস্থিত সুখ, দুঃখ সব ভুলিয়া গেলেন। বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষুজল মুছাইয়া কহিলেন, কাঁদিও না,তুমিত আর সৃষ্টিছাড়া কাজ কর নাই।

স্বামী—আমি তোমায় মলিন মুখ দেখিতে পারিব না।

"না, তোমার তাহা দেখিতে হইবে না, এই আমি হাসিতেছি" বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী হাসিতে লাগিলেন।

স্বামী—দেখ ছয় মাস চাকুরী করি, ছয় মাস বসিয়া থাকি, এইরূপ গোলমালে টাকা পয়সার সংস্থান করিতে পারি নাই। একটা বাড়ীও করা হয় নাই। এই সব কারণে মন বড় খারাপ হইয়াছে।

স্ত্রী কহিলেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার অসুখ কিসের?

স্বামী—টাকার অভাব তুমি কিরূপে নিবারণ করিবে?

কেন আমার গহনাগুলি লও, কলিকাতার একটা বাড়ী কর। যখন তোমার কাজ থাকিবে না, তখন সেই বাড়ীতে ছুলতীনে গিয়া বাস করব। যখন তোমার কাজ থাকে না, তখন আমি পিত্রালয়ে বাস করি, কিন্তু সতীন্ লইয়া ত তাহা পারিব না। একটা বাড়ী করিতেই হইবে, এই বলিয়া ছুবুটী ঠাকুরাণী গহনার বাক্স আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন, স্বামী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ত্রীর গহনাগুলি গ্রহণ করিলেন।

শাবস্ত ইঞ্জিনিয়ারী করিয়া অনেকগুলি জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন। এক দিন ছুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীকে কহিলেন, বাড়ী ঘর নাই, তোমার জিনিসগুলি লইয়া আমার বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বামী কহিলেন,"—আচ্ছা।"

পর দিন বৈকালে ছুবুটী ঠাকুরাণী বেড়াইতে গিয়েছিলেন, কতিপয় প্রতিবাসী স্ত্রীলোক গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার সমুদয় জিনিসপত্র লইয়া চম্পট দিতেছেন।

স্ত্রী যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে আসিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসিনীর কথাই সত্য। ব্যাপার যে কি, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না, গরুর গাড়ীর উপর হইতে জিনিসপত্রগুলি নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীও কিছু কহিলেন না, ধুতি চাদর পরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী বাড়ী করিতেই কলিকাতা গিয়াছেন, তিনি তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। পিত্রালয়েই রহিলেন, কিন্তু এক বৎসর স্বামীর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। অতঃপর শুনা গেল, শাবস্ত বাবু নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া আসাম চলিয়া গিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার কাজও হইয়াছে।

স্বামী বাড়ী করেন নাই; তাহার গহনাগুলিও ফেরত দেন নাই; নবপরিণীতা পত্নীসহ বহুদূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, এই ভয়ানক কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ছুবুটী ঠাকুরাণী প্রথমে শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেন, তাহার পর তাহার ভাগিনাকে সঙ্গে করিয়া আসামে চলিলেন।

বাসন্তী উষা চলিয়া গেল, প্রীতিময়ী প্রভাতীর সঙ্গে সঙ্গে অযুত ফুল ফুটিয়া উঠিল। কোকিলের কলনাদে ঝলকে ঝলকে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল, বালারুণ তখনও জ্যোতি বিকিরণ করে নাই, সমীরণ তখনও বরফের মতন শীতল। এই সময়ে ছুবুটী ঠাকুরাণী স্বামীর সংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্বামী শয্যায় শুইয়া তখনো নাসিকা গর্জ্জন করিতেছিলেন, পার্শ্বে বালিকা স্ত্রী নিদ্রায় অভিভূতা। মামীকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগিনা দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মামা! মামা! বলিয়া ডাকিলেন। শাবস্ত বাবু জাগ্রত হইয়া বলিলেন, কেও?

ভাগিনা। আজ্ঞে আমি।

মামা। কেও, রশি?

ভাগিনা। আজ্ঞা।

মামা উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, সব ভাল ত?

ভাগিনা—মামীমা এসেছেন।

অাঁ, অাঁ অাঁ তোমার মামীমা কে? কে? বলিতে বলিতে মামামহাশয় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। ভাগিনা বলিলেন,—চিনিতে পারিতেছেন না?

সেই সময় শারন্তবাবুর নববিবাহিতা স্ত্রী শয্যা হইতে উঠিয়া দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর দিকে বার বার চাহিতে ছিলেন। স্বামী সে ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার মনোভাব গোপন করিয়া ফেলিলেন, ও তাড়াতাড়ি বালিকা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমার দিদি এসেছেন স্থল!

স্থলপদ্ম—আপনি যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন বলিয়াছিলেন আপনার মধ্যমা স্ত্রী কুৎসিতা, কুরূপা, চিররুগ্না ও চলৎশক্তিহীনা।

স্বামী—ওঃ! সে তোমার চিত্তরঞ্জনের জন্য।

এই কথার পরই ছবুটী ঠাকুরাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর কথা, সতীনের কথা, দুই শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

স্বামী—একি? এত দূরের পথ একজন বালকের সঙ্গে আসিয়াছ, তোমার কি ইজ্জতের ভয়ও নাই?

ছবুটী—আছে বইকি, তবে পেটের দায়ে সবই করিতে হয়। যখন গহনাগুলি লইয়া পলাইয়েছিলে, তখন এই ক্ষুৎপিপাসিতার ইজ্জত কে রক্ষা করিয়াছিল?

স্বামী—সে কথা এখন থাক, এখন যাও, ঐ সাম্‌নে একটা দিঘী আছে, সেইখানে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া এস। বেলা হইলে লোক জমিবে। ছবুটী ঠাকুরাণী তাহাই করিলেন।

এই অবসরে তাহার স্বামী লোহার বাক্সটা সরাইয়া ফেলিলেন। ছবুটী ঠাকুরাণীর ভাগিনা এ সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সেই লোহার বাক্সে তাঁহার গহনা ছিল। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে কহিলেন। স্বামীও রাগিয়া ফুঁদিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ আমার যা খুসী করব, তোমার তাতে দরকার কি?

ছবুটী—লোহার বাক্সের কথায় আমার দরকার নাই সত্য, কিন্তু আমার গহনাগুলির কথায় ত আমার দরকার আছে। সেগুলি কোথায় রেখেছ আমি শুনিতে চাই।

(ক্রমশঃ)।

# আমরা কি চাই।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )।

(৬) দেশের কতকগুলি কাজ করিবার জন্য একটী সম্প্রদায় গঠিত হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এই সম্প্রদায় নেতৃবর্গদ্বারা চালিত হইবে। গ্রামে গ্রামে দুই একজন, নগরে নগরে বিশ, পঁচিশ জন এই দলের লোক থাকা চাই। ইঁহাদের প্রধান কাজ হইবে লোকশিক্ষা। ইঁহাদিগকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইতে হইবে, এবং দেশের উপকারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সকল ধর্ম্ম এবং সকল জাতির প্রতি ইঁহাদের সমভাব হওয়া চাই।

মৃত মহাপ্রাণ নফরচন্দ্র কুণ্ডু এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইঁহাদের ভরণপোষণের ভার দেশকে লইতে হইবে, কারণ নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হইলে সাধারণের কাজে ইঁহারা মন ও বেশী সময় দিতে পারিবেন না। এ কাজের জন্য প্রচুর অর্থ চাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল কাজই অর্থ সাপেক্ষ। অর্থ আমাদিগকে যোগাইতে হইবে। না পারি কাজ হইবে না। তবে রোম নগর এক দিনে গঠিত হয় নাই। আমাদের শক্তি অনুসারে অল্প মাত্রায় কাজ আরম্ভ করা হউক। ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। যে সব লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, অবস্থানুসারে তাঁহাদের অনেককেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভাবনা যদি ভাবিতে হয়, বিলাস-দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালনে ইঁহারা সক্ষম হইবেন না। সাধারণতঃ এই নিয়ম হওয়া চাই, অবস্থাভেদে ইহার ব্যতিক্রম হইতে যে না পারিবে এরূপ নয়। উপরে বলিয়াছি, ইঁহাদের কাজ হইবে প্রধাণতঃ লোকশিক্ষা। শিক্ষার মানে অবশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা। দেশের সকল ভাল কাজে ইঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইবে, এবং দেশের লোককে চরিত্রের উচ্চতম আদর্শ দেখাইতে হইবে। চিরজীবনই যে ইঁহাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে হইবে তাহা নহে। একটী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করার পর সকলের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার অধিকার থাকিবে। দেশে অনেক বিধবা রমণী আছেন। তাঁহাদিগকে কি এই সম্প্রদায়ের এক শাখাভুক্ত করিয়া দেশের অনেক কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে না? আমাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর বড় অভাব। প্রতি গ্রামের দুই চারিটী বিধবাকে শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করাইতে পারিলে দেশের যে কি মঙ্গল হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থার কাজটী সম্ভবপর কি বলিতে পারি না,

কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? একাগ্র যত্ন ও চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিধবাদের উপযুক্ত আরও অনেক কাজ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করিলাম না।

(৭) সমাজসংস্কার। সমাজে অনেকগুলি কদর্য্য প্রথা আছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের উচ্ছেদসাধনা করিতে না পারিলে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। বামাবোধিনীর কলেবরের পক্ষে প্রবন্ধ খুব বড়ই হইয়াছে, এবং সমাজসংস্কার বড় বিশাল প্রশ্ন। এ স্থানে এ প্রশ্নের আলোচনা হওয়া অসম্ভব; এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই মাত্র। আমরা নিশ্চেষ্ট এবং এই নিশ্চেষ্টতা সজীব; আমরা রক্ষণশীল, এবং এই রক্ষণশীলতা অন্ধ। এখন আমাদিগকে এই সজীব নিশ্চেষ্টতাকে নির্জীব করিতে হইবে, এই অন্ধ রক্ষণশীলতাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে। যে সব প্রথা আমাদের উন্নতির প্রতিকূল, একতার প্রতিকূল, তাহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে; নতুবা আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব মাত্র। হিন্দুর মুসলমানের প্রতি যে ঘৃণা, তাহা দূর করিবার সময় কি আসে নাই? বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমানে একত্র মিলা মিশা যত কম, হিন্দুস্থানের আর কোথাও তত নয় বলিয়া মনে হয়। হিন্দুর ঘরে কুকুর প্রবেশ করিলে যে সব জিনিষ নষ্ট হয় না, মুসলমান প্রবেশ করিলে তাহা নষ্ট হয়। ইহা কি ঠিক? ইহা কি আত্মদ্রোহিতা নয়? মুসলমানকে বলি, হিন্দুকে কি তোমার পর ভাবা উচিত, পর ভাবিলে কি চলিতে পারে? তাহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করিলে, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে কি তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না? তোমার কর্ত্তব্য পালনে দোষ পড়িবে না? হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মভেদ ও কিয়ৎপরিমাণে আচারভেদ আছে বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইতে পারে না? তারপর হিন্দুসমাজের নিম্নতর স্তরের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। উচ্চতর স্তরের হিন্দুর নিম্নতর স্তরের হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যদি সমাজ ছারখার করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে নিম্নতর জাতির প্রতি এ নিষ্ঠুর ব্যবহার পরিহারের সময় আসে নাই কি? এই অত্যাচার ও উৎপীড়নে তারা যদি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হইবে কি? অনেক জাতি আছে, যাহাদের লোকেরা বেশ শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হইলেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসেন না; যাহাদের লোকেরা খুব নিষ্ঠাবান্ হইলেও তাহাদের জল স্পর্শ করেন না। জিজ্ঞাসা করি,—এরূপ আর কতদিন চলিবে? সময় ও শিক্ষার গুণে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ

ক্রমে প্রবল হইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যদি ইহাকে উৎসাহ না দিয়া অবজ্ঞা করেন, ক্ষতি বেশী হইবে তাঁহাদেরই এবং সমাজের বিশেষ অপকার হইবে। আর এক দিকে দেখুন। সমাজের এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ হয় না। রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রশ্রেণীর বাড়ী বিবাহ করিতে পারেন না। দক্ষিণরাঢ়ীর কায়স্থ উত্তররাঢ়ীর কায়েস্থের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে পারেন না। অন্যান্য জাতির ভিতরও এরূপ। এক শ্রেণীর ভিতরেও সকলের সঙ্গে সকলের কুটুম্বিতা হইতে পারে না। ইহাতে কি সমাজের অনিষ্ট হইতেছে না? এ দুষ্ট প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা সকল বুদ্ধিমান্, দেশহিতৈষী ব্যক্তির করা উচিত। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা কায়স্থ সমাজে এই প্রথা উঠাইবার কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা হইতেছে। ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহ উঠান দরকার নয় কি? কিন্তু অনেক শিক্ষা ও জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিকেও আপন আপন শিশু পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে দেখিতে পাই। বাল্যবিবাহের অত্যাচারে আমরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি, বালকবালিকার শরীর উৎসন্ন যাইতেছে, রুগ্ন ও নির্জীব সন্তান উৎপন্ন হইতেছে, মানসিক বল ও তেজের, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের উদ্রেক হইতেছে না, তবু কয়জনকে এই কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায়? এবং ইহার উচ্ছেদসাধন না হইলে আমাদের বিশেষ ভরসা কিছু আছে কি? সমাজসংস্কার সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলিতে চাহি না। আমার মনের ভাব সহজে অনুমিত হইবে।

(৮)

বঙ্গীয় হিন্দুমহিলাকে দুই এক কথা বলিয়া আজ ক্ষান্ত হইব। সে দিন এক ইংরাজী কাগজে দেখিলাম,—স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে তাঁহারা প্রধান সহায় হইয়াছেন। তাঁহাদের ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক পুরুষসিংহকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গ মহিলার এ কথা গৌরবের কথা নয়। এখন আর কে বলিবে যে তাঁহারা অবলা? তাঁহারা খুব প্রবলা। তাঁহাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে,—তাঁহারা সমাজের কল্যাণ সাধন ব্রত গ্রহণ করুন এবং সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হউন। কবির কথা ঠিক।

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

দেশের শিশুদিগের হৃদয়ে যদি উচ্চ ও উদার ভাবের বীজ বপন করিতে হয়, তাঁহারা ছাড়া তাহা কে করিতে সক্ষম? দেশের পুরুষদিগকে যদি সৎকাজে ব্রতী করিতে হয়, তাঁহারা না করিলে তাহা আর কে করিবে? মুসলমান ও নিম্নতর জাতির প্রতি ব্যবহারের মূলে তাঁহারা। উহার ছোঁয়া জিনিষ গ্রহণ করিলে উহাকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হইবে এই

সব ভাবের প্রাবল্যের প্রধান হেতু তাঁহারা। সকল দিক ভাবিয়া এ সম্বন্ধে যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা একটু উদারতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে যে কি কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যবিবাহের মূলেও অনেকটা তাঁহারা। শিশু পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহারা জিদ করেন বলিয়াই বাল্যবিবাহের সংখ্যা বিশেষরূপ কমিয়া যাইতেছে না। মহিলারা যদি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, কোন পুরুষের ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবার সাহস কুলাইবে? করজোড়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা সমাজসংস্কার-ব্রত গ্রহণ করুন, আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন অন্তর্হিত হইবে।

"বন্দে মাতরম্।"

---

# স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত বাল্যলীলা।

এই মহাপুরুষের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ১৩১৩ সালের বামাবোধিনীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এবারে তাঁহার অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত এবং বাল্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জব্বলপুরে ঠগী আপিসে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তথায় স্বকৃত ভবনে সপরিবারে বাস করিতেন। হরচন্দ্রের প্রথম কন্যা ভবতারিণীর জন্মের পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণ এবং কন্যা নিস্তারিণী জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্তানত্রয়ের জন্মের পরে ১৪ বৎসর কাল হরচন্দ্রের আর সন্তান সন্ততি হয় নাই।

হরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র অল্প বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করেন। আর সন্তান হইল না বলিয়া, হর চন্দ্র ও তদীয় পত্নী চন্দ্রমণি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। এই সময় হর চন্দ্রের সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশ চন্দ্র আসিয়া দেখা দেন, এবং ভ্রাতৃবধূ চন্দ্রমণিকে একটী মাদুলী দিয়া বলেন, "ইহা ধারণ করিলে আবার সন্তান হইবে।

এই ঔষধ ধারণের অনতি বিলম্বে চন্দ্রমণির সন্তানের লক্ষণ হইল। দশ মাস দশদিন অতীত হইলে একদিন চন্দ্রমণির প্রসববেদনা উপস্থিত জানিয়া, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধাত্রী ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার সেই সন্ন্যাসী ভ্রাতা বগলে একটী কাল পাঁটা, হস্তে একখানি ছুরিকাসহ বনমধ্য হইতে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং বলিলেন,— ধাত্রী ডাকিতে

হইবে না।"তখন তিনি পাঁঠাটী বাম হস্তে শূন্যে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তস্থ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে প্রসূতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সন্ন্যাসী মহেশ চন্দ্র নব প্রসূত সন্তান বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহার নাড়ী কাটিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সাত মাস অতীত হইল। সন্তানের অন্নপ্রাশন দিবার জন্য হরচন্দ্র আয়োজন করিলেন এবং অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসী ভ্রাতা মহেশচন্দ্র পুনঃ দেখা দিলেন, এবং শিশুর অন্নপ্রাশন কার্য্য শেষ করিয়া উঁহার নাম কালীচরণ রাখিলেন। মহেশ চন্দ্র এবার যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই ছেলেকে তোমরা কোনরূপ কষ্ট দিওনা; কষ্ট দিলে তোমরা ইহাকে রাখিতে পারিবে না।"

কালীচরণের পঞ্চম বর্ষ বয়সে হরচন্দ্র তাহার হাতে খড়ি দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণের প্রতি শিশুর বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। একদিন শিক্ষাদান কালে তিনি কালীচরণকে একটী চপটাঘাত করেন। এই সামান্য প্রহারে কালীচরণ অবিরাম কান্দিতে লাগিলেন। কান্না কিছুতেই থামেনা। পিতা মাতা চিন্তাকুল হইলেন। এমন সময় সন্ন্যাসী মহেশচন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইলেন এবং রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কালীচরণের ক্রন্দন থামিল। সন্ন্যাসী রোষভরে বলিলেন,—"তোমরাএই অমূল্য রত্নকে না চিনিয়া ইহাকে কষ্ট দিতেছ, অতএব ইহাকে রাখিতে পারিবে না"। এই বলিয়া তিনি কালীচরণকে মাতৃক্রোড়ে অর্পণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রমণি অনেক অনুনয় বিনয়ের সহিত তাহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু মহেশচন্দ্র ফিরিলেন না।

কালীচরণ এগার বর্ষে পদার্পণ করিলেন। হিন্দু প্রথানুসারে উঁহার উপনয়নের দিন স্থির হইল। কালীচরণকে কালীঘাটে লইয়া দীক্ষা দেওয়া হইল। উপনয়নের দিন "ইহাকে তোমরা রাখিতে পারিবে না." সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যৎ বাণী মনে হওয়ায় সকলে মায়ের মন্দিরাভ্যন্তরে কুণ্ডলী করিয়া তন্মধ্যে কালীচরণকে রাখিয়া মন্দিরের দরজা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করতঃ রাত্রিযাপন, করিলেন। সকলের মনে ভয় ছিল, পাছে কালীচরণ এই রাত্রে দণ্ডী হইয়া বাহির হইয়া যান। এই রাত্রি নিরাপদে প্রভাত হওয়ায় সকলেরই সাহস হইল কালীচরণ সংসারত্যাগী হইবেন না। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীর ভয় কটিয়া গেল।

কালীচরণ অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। স্নান আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করিতেন এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে দেব দেবীর বন্দনাদি শুনাইতেন। কালীচরণ মধুরভাষী ছিলেন বলিয়া চন্দ্রমণি কালী চরণের নিকট রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শুনিতেন।

কিছুকাল পরে কালীচরণের পিতার মৃত্যু হইল। তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবীচরণ পশ্চিমাঞ্চলে জব্বলপুরে পৈতৃক আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। কালীচরণ কলিকাতায় বাসা করিয়া বিধবা ভগিনী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ বাস করিতে লাগিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

প্রগাঢ় যত্ন ও অসামান্য অধ্যবসায় প্রভাবে কালীচরণ অচিরে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতুলনীয় স্মরণশক্তি ছিল। কোন নূতন পুস্তক পাইলে তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল কালীচরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উহার সার গ্রহণ করিলেন, ইহাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সরলতা সত্যপরায়ণতা ও উদারতাগুণে কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক মিশনারীদিগের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কালীচরণ যে বিধবা ভগ্নী ও ভ্রাতৃপুত্র সহ কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তাহারা একে একে কালগ্রাসে পতিত হইল। কালীচরণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় মিশন হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট ইংরাজিতে "হৃদয়বিদারক যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় দাদা,

সম্প্রতি আমাদের যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আপনার গোচরার্থে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আমাদের প্রিয়তম বিধবা ভগ্নী মায়াপাশ ছিন্ন করতঃ পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব, আশার আধার প্রিয়তম আত্মজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ায় আপনার হৃদয়ে অতুল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু দাদা, আপনার হরিষে বিষাদ জন্মাইয়া আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। না জানি এই পত্র পাঠে আপনার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে! যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনিবার্য্য, ভাবিলে বা আর্ত্তনাদ করিলে কোনও ফল হইবে না।"

অনেক দিন পরে কালীচরণের পত্র পাইয়া অগ্রজ ব্যগ্রচিত্তে সহর্ষে পত্র উন্মুক্ত করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল, এবং কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষণেক পরে উন্মত্ত প্রায় হইয়া এক কাটারী হস্তে "কেলেকে কাটিব" বলিয়া বেগে ধাবিত হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী চাকর ছুটিল।

রেল ষ্টেসনের সকলেই তাঁহাকে চিনিত ও সম্মান করিত। ষ্টেসন মাষ্টার ভৃত্যের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার টিকিট দিয়া ভৃত্য সহ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া তিনি উন্মত্ত ভাবে কালীচরণের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা মিশন

হাউস্ অভিমুখে চলিলেন।* মিশন হাউসের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কালীচরণের দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র কালীচরণ দ্বিতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং মিশনহাউসের আঙ্গিনায় ভ্রাতৃদ্বয় গলাগলি করিয়া কান্দিতে কান্দিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিশন হাউসের ভক্তবৃন্দ কালীচরণ ও তাহার ভ্রাতাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলেন।

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, কালী! ভগ্নী ও পুত্র শোক আমি সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তুই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিলি! এই অসহনীয় বিচ্ছেদশোক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। কালী তোর বিচ্ছেদে আমার এই অবস্থা, বৃদ্ধা মাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। ভাই! ফিরিয়া বাড়ী চল, তুই বল, আমি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হই নাই।"

কালীচরণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দাদা, যেমন স্থির জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে, সমস্ত জল আলোড়িত হয়, তদ্রূপ আমার প্রশান্ত হৃদয় ভগ্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকাঘাতে তরঙ্গিত হওয়ায়, আমি বিচলিত হইয়া সংসারত্যাগের বাসনা করিয়াছিলাম এবং কিরূপে সংসার বন্ধন ছিন্ন করতঃ পরিণামে অনন্ত জীবন পাইব, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলাম। পরিশেষে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আত্ম সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি। আমার জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না; ফিরিয়া ঘরে যাউন। আমি আপনার সেই ভ্রাতৃবৎসল স্নেহের ভ্রাতাই আছি। ইহজগতে পূর্ব্ববৎ প্রেমবন্ধনে উভয়ে আবদ্ধ থাকিব। কেবল-মাত্র পরিণামের মুক্তিমার্গ স্বতন্ত্র গৃহীত হইল।

জ্যেষ্ঠ অনেক কান্দিলেন, কালীচরণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিফলকাম হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ভগ্ন হৃদয়ে মিশন হাউস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্ব ঘটনাবলি যুগপৎ দেবীচরণের মনে পড়িয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, উঃ! সন্ন্যাসী খুল্লতাতের ভবিষ্যৎ বাণী—

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বাতুলের ন্যায় প্রকাশ্যে বলিলেন,—

শ্যামা মার বরপুত্র তুমি দেব-দূত,
জন্ম নিলে অবনীতে হয়ে নরসুত।
ভ্রাতৃভাবে অতি যত্নে রেখেছিনু তোকে,
তোমা হারা হয়ে এবে ডুবিলাম শোকে।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

* মিশন হাউস—১৯ নং ডফ ষ্ট্রীট অধুনা যে স্থানে (United Free Church Girls' School) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

# গীতার ব্যাখ্যা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )।

লও জীব চিরকাল আমার শরণ;
দূরে যাবে ভব-ভয় পাবে পরিত্রাণ।

এই দুইটী পংক্তিই গীতার মূল মন্ত্র ও চরম শিক্ষা। এই মন্ত্রটী ভারতনারী নিবিষ্ট ভাবে ও ভক্তিবিপ্লুত হৃদয়ে জপ করিলে বুঝিতে সক্ষম হইবেন, এই পৃথিবীতে ধন জন এ সকল অস্থায়ী। ব্রহ্মরূপাই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারি অনন্ত কৌশলের ক্রীড়াভূমি। মোহাচ্ছন্ন মানবকে প্রকৃতি সহস্রবার অসংখ্য সঙ্কেতে সেই ভবের কাণ্ডারীর শরণ লইতে মনকে উত্তেজিত করে। ভক্তের অতি সামান্য উপহারও ভগবান্ প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।

আমি সুহজে মিলিত হই, পাপীর সনে
যদি ডাকে একবার কাতর প্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা
আমার দেখা পায়না তারা।
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।

ভগবান্ এই উক্তি দ্বারা পাপীকে অভয় দিয়া থাকেন। প্রভু অধম সন্তানকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। জগাই মাধাই তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা যতই হীন হইনা কেন, তাঁহার সুশীতল অভয়বাণী ঘোর বিপদসাগরেও ভক্ত মানবের জীবনতরণী সুপথে চালিত করে। ঘোর পাপের আবর্জ্জনায় যখন লুণ্ঠিত হইয়া ও অকূল সলিলে ডুবিয়া প্রাণ মৃত হয়, তখন কাহার অনন্ত শক্তি পাপীকে সংসারের কর্দ্দম ধৌত করিয়া স্বর্গের পথে চলিতে বলীয়ান্ করেন, সহস্র পাপে জীবন কলঙ্কিত হউক না কেন, আমরা অভূতপূর্ব্ব চেতনা লাভ করিয়া ধন্য হই ইহাই ঈশ্বরের বাণী।

গীতা পাঠের উপকারিতা ভারত নারীগণের মনে উদ্দীপ্ত করিবার আশায় আমি সংক্ষেপে গীতার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলাম। ভারতনারী পুরাকাল হইতে ধর্ম্মপ্রবণহৃদয়া বলিয়া বিখ্যাত আছেন, জ্ঞান সভ্যতার আলোকে সেই গুণ বিসর্জ্জন না করিয়া বর্দ্ধিত করিতে প্রাণ মনের সহিত যত্নশীলা হউন, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা।

---

# আর্য্যদিগের রন্ধন-শালা ও ভোজনস্থানাদি।

যৎকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের রন্ধন বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তৎকালের আলোচ্য রন্ধননিয়ম সমুদায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই যে, রন্ধনগৃহাদি নির্ম্মাণ, ভোজনস্থান নির্দ্দেশ ও পাকপাত্রের নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহাদের অনেকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম

ছিল। ভবনস্থ স্থানসমূহের মধ্যে রন্ধন-গৃহ নির্ম্মাণেরও একটী দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ বিশেষতঃ নৃপতিগণ এই নিয়ম পালন বিষয়ে যথোচিত যত্ন করিতেন। কোন্‌দিকে কোন্ গৃহ নির্ম্মাণের বিধি ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় ;—

"প্রাচ্যাং দিশি স্নানগৃহমাগ্নেয়্যাং
পচনালয়ম্।
"শয়নং যাম্যদিগ্‌ভাগে নৈঋত্যাং
শস্ত্রমন্দিরম্।
প্রতীচ্যাং ভোজন-গৃহং বায়ুভাগে সভাগৃহম্।"
( ইত্যাদি মুহূর্ত্তচিন্তামণিটীকায়াং
কশ্যপবচনম্।)

অনুবাদ। পূর্ব্বদিকে স্নানগৃহ, অগ্নিকোণে রন্ধন শালা, যাম্যদিগ্‌ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে শয়ন গৃহ, নৈঋতকোণে অস্ত্রালয়, পশ্চিমদিকে ভোজনগৃহ, ও বায়ুকোণে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

উল্লিখিত শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে, পাকশালা ও ভোজনশালা এক ছিল না, অর্থাৎ যে গৃহে রন্ধন করা হইত, সেই গৃহে বসিয়া ভোজন করিবার নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও অনেক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের ভবনে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। একই গৃহে রন্ধন ও ভোজন হইলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পিপীলিকাদি কর্ত্তৃক নীত হইয়া তৎসংস্পর্শে খাদ্যবস্তুর পবিত্রভাব নষ্ট হইতে পারে। রন্ধন গৃহটী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য। রন্ধনগৃহে একেই অগ্নির উত্তাপাদি বর্ত্তমান থাকে, ইহার উপর আবার ভোজনার্থে তথায় বহুলোক সমাগত হইলে তাহাতে উত্তাপাধিক্য ও নিশ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু দুষ্ট হইতে পারে। যেখানে স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করেন, সেখানে তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবে থাকিবার নিয়মই ভাল। হয়ত, কখনও কার্য্যব্যগ্রতা প্রযুক্ত মহিলাদিগের অসাবধানতা ঘটায়, লজ্জাশীলতারও ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এ জন্যও পাকগৃহ এবং ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকা ভাল। বোধ হয় এবম্বিধ আরও অনেক যুক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারগণ রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ রাখিবার জন্য সাধ্যপক্ষে সকলকে যত্ন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লিগ্রামে সাধারন গৃহস্থের ভবনে যদিও রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ প্রায় পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাপি সেই স্থানের পবিত্রতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। অশিক্ষিত গৃহস্থেরও সংস্কার আছে, রন্ধনগৃহে অবশ্য একাধিক জানালা রাখা চাই। আবার পাকশালার যেখানে রন্ধন হয়, সেই স্থানটি মৃত্তিকাদি দ্বারা মেজে অপেক্ষা একটু উচ্চভাবে নির্ম্মাণ করা হয়। সেই দিকে জলের কলসী রাখিবার জন্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ পীঠ শৃঙ্খলতার সহিত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ উহা সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং উহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক।

উক্ত নিয়মে রন্ধনগৃহের রন্ধনস্থান পৃথক থাকাতে বোধ হয় যে, পাক স্থান ও ভোজনস্থান একই গৃহে হইলেও যেন উক্তরূপ বিধিবিশেষ দ্বারা দুইটী পৃথক্ গৃহের অনুকল্পভাব রক্ষিত হয়। যাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে, এজন্য নগরে দুই তিনটীমাত্র কুঠুরি ভাড়া করিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গৃহের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং রন্ধনগৃহ ও ভোজনগৃহ পৃথক্ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া সাধ্যপক্ষে উক্ত উভয় গৃহ যথাসম্ভব পৃথক্ রাখাই ভাল।

(ক্রমশঃ)।

---

# বিধবা-বিবাহ।

বহুদিনের বহু পুরাতন কথা আজি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেননা শ্রীযুক্ত অশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা বালিকা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে হিন্দু সমাজ-সমুদ্রে যে স্রোতঃ ছুটিয়াছে, তাহাতে অন্য নূতন বিষয় অবতারণা অপেক্ষা "বিধবা-বিবাহ"-রূপ পুরাতন বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজনটা অত্যন্ত অধিক দেখিতেছি।

হিন্দুসমাজে স্থিতিশীল এবং উন্নতিশীল এই দুই সম্প্রদায় আছেন। উভয় পক্ষই সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সমাজের মঙ্গলসাধনই উভয় পক্ষের প্রাণগত কামনা। তবে উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহা আছে তাহাই থাকুক; নূতন রীতি নীতি সংস্পর্শে সমাজ বিশৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইবে, অতএব যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু ভ্রম, যাহা কিছু দোষ তাহা সংশোধন না করিয়া পুরাতন জীর্ণ রোগের মত নীরবে বহন করাই কর্ত্তব্য; এইরূপ বিবেচনায় পুরাতন প্রথা সকল রক্ষা করা, এবং নূতন প্রথা হইতে সমাজকে বিযুক্ত রাখা ইহাই স্থিতিশীল দলের কার্য্য। আর সমাজের যাহা অহিতকর, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন এবং যাহা কল্যাণকর তাহার গ্রহণ ও প্রচলন, সর্ব্বতোভাবে জীর্ণ সংস্কার করা—ইহাই উন্নতিশীল দলের কার্য্য। এই দুই সম্প্রদায়েই এদেশের কৃতবিদ্য, প্রাজ্ঞ, মনস্বী ও সহৃদয় মহাশয়গণ আছেন; সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য ও মঙ্গল নিহিত আছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি এই সকল মহাত্মাগণের চরণ বন্দনা করিয়া, নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইঁহাদিগের বল ভরসায় আশ্রয় লইয়া, যাহা বলিবার তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্য—সেবাব্রতে আমার গুরু তুল্য, আমার পথ-প্রদর্শক, তাঁহাদের উজ্জ্বল আলোকে আমি নিজের সমস্ত অন্ধকারটা মিলাইয়া দিতে পারিব, এই রকম আশা করিতেছি।

আর্য্য ভারতে ঋষিগণই সমাজের শিক্ষক

ও পরিচালক ছিলেন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ সমূহকে শাস্ত্র বলা হয়। হিন্দু জাতিকে শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিতে হয়। জন্ম মৃত্যু বিবাহাদি সংস্কার হইতে দৈনিক কার্য্যও শাস্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করা হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে যে ঋষিগণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের নিয়ন্তা স্বরূপ, সেই শাস্ত্রকার ঋষিগণের প্রকৃতি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাঁহারা যে কি প্রকার বিরাট পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের জনহিতৈষণা যে কি প্রকার সার্ব্বভৌমিকী ছিল, তাহা আজি শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বঙ্গভূমির কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" পত্রে যাহা লিপিবদ্ধ করেন, আমরা তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদিগের ধর্ম্ম মানব ধর্ম্ম; মানবের ক্রমোন্নতি লাভেই তাহা আত্মতৃপ্ত হইয়া সাফল্য লাভ করে। সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইলে পরকে আপন করিতে হয়, ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়; নরনারীর কল্যাণকামনায় আপনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হয়। বাহুবলে প্রাচ্য সভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে না। তাহা পাশব ধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানব ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনায় দীর্ঘ তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন উদার নীতির উপদেশ বিতরণ করিতেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইতে পারিত।"

এই সকল মহামহিম ঋষিগণ প্রদত্ত উপদেশানুসারে চলিতে পারাই জীবনের সার্থকতা। যাহা হউক, ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণ (ঋষিগণ) মানবজীবনের ক্রমোন্নতি লাভের যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, পুরাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু হইয়া ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র 'অথাতোঽধিকারঃ।' অথ—অতঃপর—অতঃ—এইজন্য—অধিকার—বিচার, অধিকার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীর নরনারীকে একই প্রকার উপদেশে শিক্ষা দান করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ।

---

## নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড রুষসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই রুষিয়া যাত্রা করিবেন। রুষিয়ার উপস্থিত অরাজকতা স্মরণ করিয়া তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার রুষ গমন যাহাতে রাজকার্য্য কিম্বা সাধারণ না হয় তজ্জন্য আবেদন করিয়াছেন।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ

ও বি-এ পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র এবৎসর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহাদের যাহাতে আগামী বর্ষের নূতন নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা দিতে না হয়, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের জন্য একটী বিশেষ পরীক্ষা করিবেন। এই সময়ের মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রস্তুত হইবার জন্য অনুরোধ।

৩। জাপান হইতে কৃষিবিভাগের দুই জন কর্ম্মচারী ভারতে আগমন করিয়াছেন এবং সিমলায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতে কৃষি, রেলপথ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবেন।

সাধুদৃষ্টান্ত। এবার দোলযাত্রায় কাশীধামের ছাত্রেরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল, যে, এবার হইতে হোলি মহোৎসবে লোকের উপর ময়লা নিক্ষেপ করা এবং অশ্লীল গান বা তামাসা করা প্রভৃতি কুপ্রথা একেবারে রহিত করিতে হইবে। তাহারা কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছিল। এই সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহারা অপরকেও ঐ কুপ্রথা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। তাহারা শুধু গুলাল, চন্দন ও গোলাপনিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং অশ্লীলগানের পরিবর্ত্তে, সুন্দর সুন্দর ঈশ্বরস্তোত্র, পুণ্যশ্লোকগণের গুণানুকীর্ত্তন গান করিয়াছিল।

পাতিয়ালার নবীন মহারাজ, নিজ শুভ বিবাহ উৎসবে বারবনিতার নৃত্য ও সুরাপান প্রভৃতি কুপ্রথা নিষেধ করিয়াছেন। ঈশ্বর নবীন মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন।

আশ্চর্য্য সৎসাহস।—২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৭ টার সময় শ্রীরামপুরে ১৪ বৎসরের একটী বালিকা সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাটীর নিকট খেলা করিতে করিতে অসাবধানতা বশতঃ কূপমধ্যে পতিত হয়। সেই দুর্ঘটনায় তাহার সঙ্গীনীরা, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সেই গভীর কূপে নামিতে কাহারও সাহস হইল না। তাহাদের চিৎকারে মন্মথনাথ রায় চৌধুরী নামক এক যুবা তথায় উপস্থিত হইল, এবং ব্যাপার শুনিয়াই কূপের মধ্যে নামিয়া দেখিল, ঐ বালিকা বিশেষ আঘাত পায় নাই। সে বালিকাকে বলিল, তুমি দৃঢ়রূপে আমার কোমর জড়াইয়া ধর, এই বলিয়া সে বালিকাকে লইয়া অতি সাবধানে কূপের এক একটী পাঠ আশ্রয় করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভারে যেই একটী পাট খসিয়া পড়ে অমনি যুবক বিদ্যুতের বেগে অপর পাট ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। এইরূপে সেই বীর যুবক, বালিকাকে লইয়া নিরাপদে উঠিল। সেই বালিকার বিধবা মাতা শোকে সংজ্ঞাশূন্যা ছিলেন। তিনি যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। ঈশ্বর ঐ ধর্ম্মবীর যুবককে চিরকুশলে রাখুন। ঐ যুবককে যথোচিত পুরস্কৃত করা সাধারণের কর্ত্তব্য।

# বামারচনা।

## নব বর্ষের নব সূর্য্য দর্শনে।

নব দেহ নব কলেবর,
উঠ দেব! কাশ্যপকুমার!
লোহিতাঙ্গ নবীন জীবন
মহাদ্যুতি জগত আধার।

ঝলমলি রতন কুণ্ডলে
পুষ্পহার পর ঐ গলে।
সাজ দেব! বিশ্ব বিমোহন
জাগাও এ বিশ্ব কুতুহলে।

যোড় করে অদিতিনন্দিনী
দাঁড়াইয়ে তোমার চরণে,
সাজাইতে চরণ দুখানি
কত ফুল তুলেছে যতনে।

গাহিতেছে বিহঙ্গ মঙ্গল,
উঠাইয়া চৈতন্য লহরী,
ছুটাছুটী করিছে কেবল,
পূর্ব্বদিকে তোমায় নেহারি।

দেখে তোমা পালাইল তম,
যায় সরে রাক্ষসী রজনী।
ঐ দেখ পেয়েছে সরম
তারাসহ শশী গরবিণী।

নব ভাব নব তেজে পূরি,
নরলোক নব আয়ু লয়ে,
জেগে দেখে তোমার মাধুরী
কর্ম্মভাব হৃদয়ে পূরিয়ে।

শ্যামাঙ্গিনী বিটপী নিচয়,
ফুল ফলে অবনত মুখে
ছড়াইয়া তোমার কিরণে
কত মধু ধরিয়াছে বুকে।

রেখেগেছে দেবতা সকল,
পূর্ণ করি সহস্র কলসী
সারি সারি শিশিরের জল,
স্নান হেতু তোমাকে সম্ভাষি।

ঐ দেখ সপ্তাশ্ববাহন,
সপ্ত অশ্ব হয়েছে যোজিত
লয়েছেন অরুণ আসন
রথোপরি হয়ে সুসজ্জিত।

কমলিনী নিদ্রা পরিহরি,
উঠিয়াছে সকলের আগে,
দেখিবারে ওরূপ মাধুরী
হাসিমুখ নব অনুরাগে।

পতিব্রতা পতিশয্যা ছাড়ি
সসম্ভ্রমে উঠেছে সকলে,
স্বামী অগ্রে, নব আশাধরি
গৃহ কর্ম্ম করিবেক বলি।

ঋষিকুল গায় বেদ গান,
তব স্তবে পরিতুষ্ট মন।
করিতেছে কত অর্ঘ্যদান
তব পদে সাত্বিক ব্রাহ্মণ।

তুমি ওহে! আরোগ্যের পতি,
বল, সেবা, পুষ্টি, তুষ্টি সার,
উদয়াস্তে তোমারি মুরতি
কালরূপে হেরি অনিবার।

মহাকাল, মহাদ্যুতি তুমি,
জ্যোতিঃপতি তেজের আধার,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য সর্ব্বস্থানগামী
ক্ষুধা তৃষ্ণা তোমাতে বিস্তার।

তুমি সত্য, তুমি যম, কাল,
সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের পতি,
গতি মুক্তি তুমি, সর্ব্বকাল,
দিনক্ষণ কলাকাষ্ঠা গতি।

ভীতা আমি, দাও তেজ মোরে,
সর্ব্বব্যাপী ওহে তেজময়!
বলহীনা কি করিতে পারে,
তুমি মোরে দাও গো অভয়।

মরি আজ দুর্ভিক্ষ-প্লাবনে,
স্বামী, পুত্র, যায় কোথা ভাসি;
ভীতা সদা দুর্জ্জয় তাড়নে,
দীনবন্ধু! রক্ষা কর আসি।

শ্রীমতী লীলাবতী জ্যোতিষী।

---

## নব বৈশাখে।

নব বৈশাখের নবীন আহ্বানে,
জাগ জাগ অয়ি মাতঃ বসুন্ধরা!
প্রেমের আঁচলে মুছাও নয়ন,
বহিতেছে যেথা সদা খরধারা।

শুষ্ক ছিন্ন পত্র ধূলি অবসান,
লুপ্ত হলো হায় পুরাতন খানি;
সারা বর্ষ ভরে ছিল শোভামান
সংসারে অশেষ প্রণয় প্রদানি।

হের নব তরু মুঞ্জরিল শাখা,
তরুণ মুকুল বিকাশিল শোভা।
প্রকৃতির প্রাণ নব সুখে মাখা,
প্রকাশিল ফিরে সুকোমল বিভা।

ঘুরে গেল ঐ কুটিল আবার,
উজল আলোক গভীর আঁধার।
অমানিশা পরে পূর্ণিমার হার,
নীলিম বক্ষে ফুটিল বাহার।

ঝরে গেলে উড়ে পুড়ে হয় ছাই,
ব্যথা জ্বালা সেথা চিহ্নমাত্র একা।
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সে তুলনা নাই,
কোথায় প্রলেপ বল সুধা মাখা।

কুলিশ আঘাতে দগধ যে ভূমি,
হে বৈশাখ! তব চরণ পরশে।
সেথা কি কুসুম জাগাইবে তুমি,
মুমূর্ষু পরাণ রহে যে অবশে।

বজ্রদাহনের বিষম উত্তাপ,
হয় কি শীতল জীমূত বর্ষণে।
গভীর যাতনা শোক মনস্তাপ,
ঘুচেনাক হায় সংসারঘর্ষণে।

জড় অচেতন ধরিত্রীর কোলে,
বর্ষে বর্ষে লভে অপহৃত ধন।
শুধুই মানব দুষ্কৃতির ফলে,
রহেগো বঞ্চিত জনম মতন।

মনোজবা রচয়িত্রী।

---

২১।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১ নং আন্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।